দাম : যোলো টাকা

সীমাহীন তুষ্টীকরণ রাজনীতির জন্যই পশ্চিমবঙ্গে জিহাদিদের প্রলয়োৎসব — পৃঃ ১৩

স্বস্তিকা

পশ্চিমবঙ্গে জিহাদিদের ভয়ে পুলিশ নিজেই আতঙ্কিত— পৃঃ ১১

৭৭ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা।। ৭ জুলাই, ২০২৫।। ২২ আষাঢ়, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

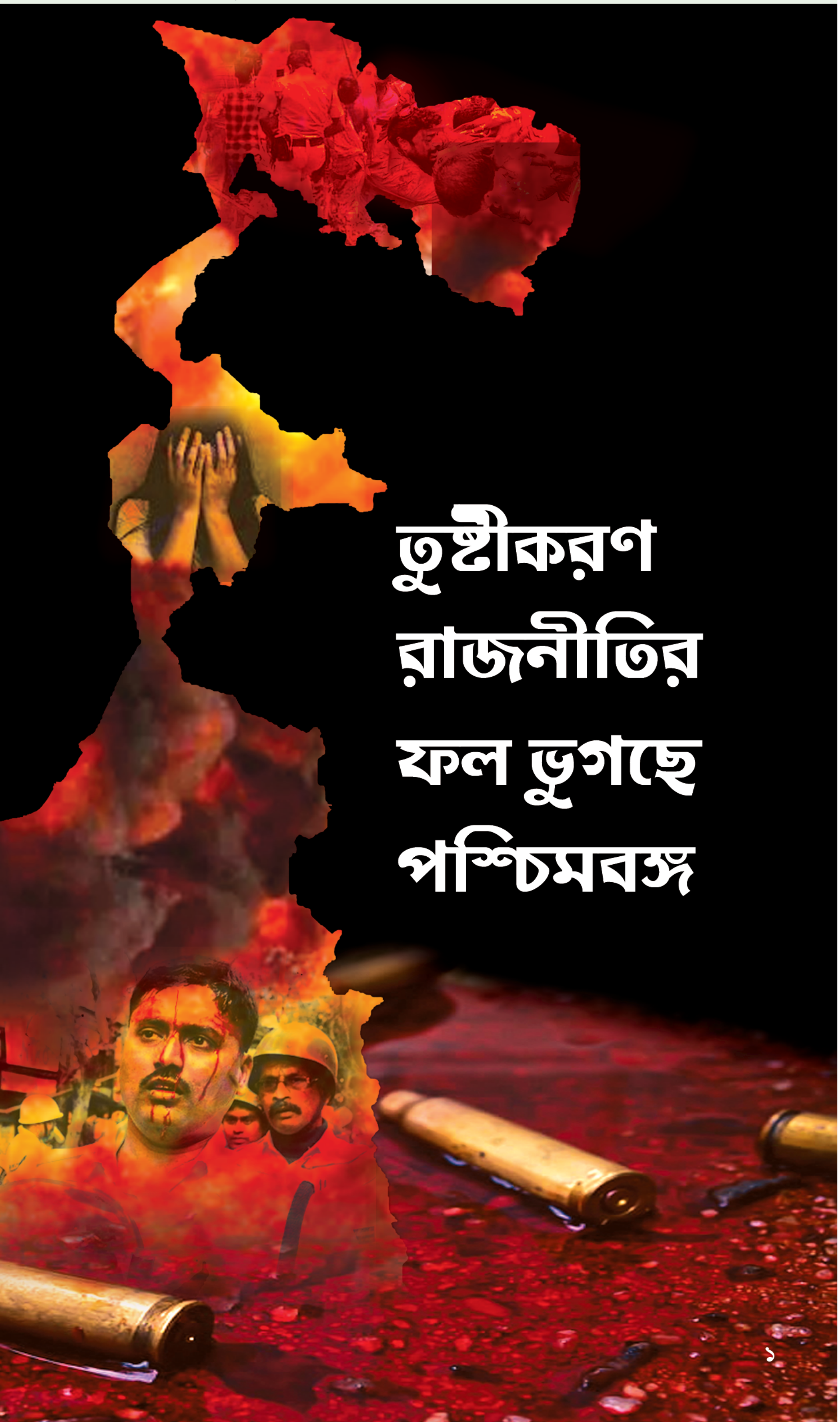

তুষ্টীকরণ রাজনীতির ফল ভুগছে পশ্চিমবঙ্গ

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**

E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা, ২২ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

৭ জুলাই - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

১৬ দিনে কর্ণের পতন, আর ১৫ বছরে মমতার?

দীঘার সার্কাসেই তৃণমূলনেত্রীর রথচক্রগ্রাস
◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

এরাজ্যে গণতন্ত্র নয়, '...তন্ত্র' চলছে ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

ভারত বিরোধিতায় কি মাত্রাছাড়া হবেন ইউনুস?
◻ স্বপন দাশগুপ্ত ◻ ৮

দুর্বলতাকে জয় করতে পারলে অবক্ষয়ের গ্লানি ঘুচবে বাঙ্গালির
◻ কৌটিল্য ◻ ১০

পশ্চিমবঙ্গে জেহাদিদের ভয়ে পুলিশ নিজেই আজ আতঙ্কিত
◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ১১

সীমাহীন তুষ্টীকরণ রাজনীতির জন্যই পশ্চিমবঙ্গে জেহাদিদের প্রলয়োৎসব ◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ১৩

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে চলেছে ভারত
◻ আনন্দ মোহন দাস ◻ ১৫

ইউনুস সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন চালচিত্র—তালিবানি দেশ তৈরির চক্রান্ত চূড়ান্ত ◻ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী ◻ ১৭

মুসলমান ভোটের দিকে তাকিয়ে ইরানকে সমর্থন কংগ্রেস ও বামেদের ◻ অজয় ভট্টাচার্য ◻ ২০

মালদহের ঐতিহ্যমণ্ডিত রামকেলি মেলা
◻ দীপশুভ্র পণ্ডিত ◻ ৩১

শ্রীল প্রভুপাদ ও গৌড়ীয় মিশন
◻ শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ ◻ ৩২

গুরুপূর্ণিমার তাৎপর্য এবং গুরু-শিষ্যের ভূমিকা
◻ শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী ◻ ৩৪

শুধু পুশব্যাক নয়, অনুপ্রবেশ রোধে চাই আরও শক্ত অবস্থান
◻ রঞ্জন কুমার দে ◻ ৩৬

ধর্ম সম্প্রদায় এবং ভারতীয় সাধনা ◻ স্বামী সত্যানন্দ ◻ ৩৮

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের জনক
◻ বটু কৃষ্ণ হালদার ◻ ৪৩

রাষ্ট্রনেতা মোদীজীর প্রধানমন্ত্রিত্বের এগারো বছর
◻ অমলেশ মিশ্র ◻ ৪৫

সাজানো মামলায় কণ্ঠরোধ করার ষড়যন্ত্র
◻ বিপ্লব বিকাশ ◻ ৪৯

গল্পকথায় ডাক্তারজী ◻ সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻ চিঠিপত্র : ১৯ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ স্মরণে : ৪৭-৪৮

ফ ঃ ১

প্রকাশিত হবে
১৪ জুলাই
২০২৫

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৪ জুলাই
২০২৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

যুদ্ধ পরিস্থিতি

মজহবি চিন্তাধারা দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্বজুড়ে বিস্তার করেছে তার বিষাক্ত প্রভাব। কমিউনিস্ট বিশ্বের প্রচ্ছন্ন সমর্থনে এখন তা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ইহুদি বিনাশে তৎপর হয়ে ইরান সম্প্রতি ইজরায়েলের বিরুদ্ধে সরাসরি সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে। ইজরায়েলের পিছনে রয়েছে আমেরিকার সমর্থন। পাকিস্তানের ভিতরেও বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধারা সক্রিয়। টুকরো টুকরো হওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাকিস্তান।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

জেহাদিদের স্বর্গরাজ্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকের প্রথম ভাগে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বব্যাপী সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার বিষয়ে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। শিকাগো বিশ্ব ধর্মমহাসভায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হইতে আগত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে তিনি বলিয়াছিলেন, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতা এই সুন্দর পৃথিবীকে দখল করিয়া রহিয়াছে। তাহারা এই পৃথিবীকে হিংসায় ভরিয়া দিয়াছে। মানুষের রক্তে মৃত্তিকা সিক্ত করিয়াছে। কত সভ্যতাকে ধ্বংস করিয়াছে। বিশ্ববাসীকে হতাশায় নিমজ্জিত করিয়াছে। তিনি আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই ধর্ম মহাসম্মেলনের প্রারম্ভে যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হইয়াছে, তাহা যেন এই ভয়ানক মানসিকতার মৃত্যুঘণ্টা হইতে পারে। স্বামীজীর সাবধানবাণীতে সেদিন কেহই কর্ণপাত করেন নাই। কেননা তাহার পরও সেই সাম্প্রদায়িক শক্তি ও ধর্মান্ধতা পৃথিবীকে দুই-দুইটি বিশ্বযুদ্ধের সম্মুখে দাঁড় করাইয়াছে। তাহার পরও জেহাদি শক্তি সারা বিশ্বে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করিয়া ভারতবর্ষকেও রক্তাক্ত করিয়াছে। তাহাদেরই এক আন্দোলন যাহা খিলাফত নামে পরিচিত, যাহার সহিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনোপ্রকার যোগসূত্র ছিল না, তাহাকেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সমর্থন করিয়া বসে। ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার যিনি পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তিনি সেই সময় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সম্মুখে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে তো হিন্দুদিগের সহিত ইহুদি, জরথুষ্ট্রীয়, বৌদ্ধ, জৈন, শিখেরাও রহিয়াছেন, তাহা হইলে কেন শুধুমাত্র হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথা বলা হইতেছে? ইহা কি ভারতবর্ষের পক্ষে বিপদের কারণ হইবে না? বিপদের কারণ যে হইয়াছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষী রহিয়াছে। সেদিন খিলাফত আন্দোলনের নামে কেরালায় হাজার হাজার হিন্দুকে হত্যা করা হইয়াছে। হাজার হাজার হিন্দু মাতা-ভগ্নীর সম্ভ্রমহানি করা হইয়াছে, হাজার হাজার হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে। কংগ্রেস নেতৃত্ব খিলাফত আন্দোলনকে স্বাধীনতা সংগ্রাম বলিয়া অভিহিত করিলেও তাহা কোনোমতেই স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল না। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্বীকার করিয়াছন, খিলাফত আন্দোলন ভারতবর্ষে মুসলমানদের মনে দার-উল ইসলামের চেতনাকে বহুগুণে প্রজ্বলিত করিয়াছে। তাহার পর এই জেহাদি শক্তির নৃশংসতা ভারতবর্ষের হিন্দুরা আরও তীব্রভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। বাবাসাহেব আম্বেদকর প্রমুখ ব্যক্তিত্ব ইহাকে 'অখিল আফত' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন. কলকাতা ও নোয়াখালিতে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার ভয়াল রূপ সমগ্র বিশ্বকে স্তম্ভিত করিয়াছে। তাহা এতই ভয়ংকর যে ভারতবর্ষের বিভাজন পর্যন্ত ঘটাইয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হইল, ভারতের তথাকথিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাহা হইতে কোনোরূপ শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। তাহার পরও জেহাদি শক্তিকে ইন্ধন জোগাইয়াছেন। শাসন ক্ষমতায় থাকিবার জন্য তাহাদের সমর্থন করিয়াছেন। যে মুসলিম লিগ দেশমাতৃকার অঙ্গচ্ছেদ ঘটাইয়াছে, তাহাদের সহিত জোট করিয়া কখনো কংগ্রেস, কখনো কমিউনিস্টরা ক্ষমতা ভোগ করিয়াছে। কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের শাসনকালে হিন্দুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগিয়াছেন। আজও যেখানে যেখানে তাহাদের শাসন রহিয়াছে সেখানে হিন্দুদের অবস্থা সঙ্গীন হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ।

পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টরা দীর্ঘদিন শাসন ক্ষমতায় থাকিয়াছে। সেই সময় তাহারা জেহাদি তোষণের চূড়ান্ত করিয়াছে। এই রাজ্যে চৌদ্দ বৎসর ক্ষমতায় রহিয়াছে কংগ্রেসেরই উপজাত দল তৃণমূল কংগ্রেস। কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের চাইতে ইহারা বহুগুণে জেহাদিদের তোষণ করিয়া চলিয়াছে। এই রাজ্যের স্থানে স্থানে ইহারা মিনি পাকিস্তান গড়িয়া তুলিয়াছে। শুধুমাত্র ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিবার জন্য সন্দেশখালির ন্যায় কত স্থানে যে জেহাদিরাজ বলবৎ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র শাসকদলের মদতে জেহাদিরা হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালাইতেছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় জেহাদিদের তাণ্ডবে হিন্দুদিগকে অন্যত্র পলায়ন করিতে হইতেছে। সম্প্রতি কলকাতার উপকণ্ঠে মহেশতলায় জেহাদিদের তাণ্ডব সমগ্র দেশ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কিন্তু রাজ্য সরকার নির্বিকার। কারণ, তাহাদের মদতেই জেহাদিদের এমন বাড়বাড়ন্ত। হিন্দুদের উপর আক্রমণ, ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, মাতা-ভগ্নীর সম্ভ্রমহানিতে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সহিত কোনো পার্থক্য করা যাইতেছে না এই রাজ্যের। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিতেছে, এই রাজ্যের হিন্দুরা কবে উপলব্ধি করিবেন, জেহাদি শক্তির তোষণকারী রাজ্য সরকারের শাসনকাল দীর্ঘায়িত হইলে এই রাজ্যের হিন্দুদের অস্তিত্ব বিলোপ হইয়া যাইবে। তাহারা কবে অনুধাবন করিবেন, এই রাজ্য ইসলামিস্তানে পরিণত হইতে আর বেশি সময়ের প্রয়োজন পড়িবে না। ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালন করিলে শুধু চলিবে না, স্বামীজীর সেই সাবধানবাণী— সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতাকে চিরতরে বিদায় জানাইতে হইবে। এই নৈরাজ্যের রাজ্যের অবসান করিতে হইবেই। ইহার জন্য রাজ্যবাসীকে মন স্থির করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত অন্য কোনো পথ নাই।

সুভাষিতম্

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্।।

দেওয়া-নেওয়া, মনের কথা বলা ও শোনা, খাওয়া ও খাওয়ানো— এই ছয়টি ভালোবাসার লক্ষণ।

১৬ দিনে কর্ণের পতন, আর ১৫ বছরে মমতার?

দীঘার সার্কাসেই তৃণমূলনেত্রীর রথচক্রগ্রাস

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

মহাভারতের আঠারো দিনের যুদ্ধে ১৬ দিনে পতন হয় কর্ণের। সপ্তদশ দিবসে। ১৫ বছরের শাসনে পা রাখতে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্ণ পারেননি। মমতা পারবেন? কর্ণের রথের চাকা মাটিতে বসে যায়। গত ২৭ জুন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রথচক্রগ্রাস হয়। দিঘালি অতিথি নিবাসের সামনে তা থমকে যায়। কার দায়িত্বে ছিল রথ? জামিনে থাকা কর্ণের শল্যরূপী চালক। রাজ্যের সর্বোচ্চ পুলিশকর্তা রাজীব কুমার। তাতে শেষরক্ষা হয়নি। কুমার ছাড়া অন্য কেউ হলে চাবকে পিঠের চামড়া তুলে দিতেন মমতা। কিন্তু এক্ষেত্রে তা অসম্ভব। মমতার অন্যায়ের কবচকুণ্ডল কুমারের হাতে বাঁধা। সারদা কেলেঙ্কারি থেকে সন্দেশখালির শেখ শাজাহান।

কুরুসভায় দ্রৌপদীর অসম্মানের সঙ্গী ছিল কর্ণ। তাঁকে বহুগামিনী বলতে সে পিছপা হয়নি। প্রমাণকোটিতে বিষ প্রয়োগ আর বারণাবতের জতুগৃহে পাণ্ডবদের হত্যার মূল চক্রী ছিল কর্ণ। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ট্র্যাজিক হিরো বানিয়েছেন। তাই বাঙ্গালি কর্ণ ভজনায় মত্ত। আমার মতে কর্ণের মতো দ্বৈত চরিত্র মহাভারতে দুটি নেই। কিছু ঘটনায় সে যেন শকুনিকেও হার মানায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে একাংশ বাঙ্গালির প্রায় এক আবেগ। তা অসাড় ও অর্থহীন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো আন্দোলনে গুরুত্ব দিত না বিদেশি সিপিএম। তাই জোর করে জাতীয় সড়ক আটকালেও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাকে গ্রেপ্তার করেননি। সিপিএম জমানায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখনো জেল খাটেননি বা পুলিশ লকআপে বন্দি থাকেননি। তার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলা নেই। ১৯৯৩-এর জানুয়ারিতে মহাকরণ নাটকের পর পুলিশ সদর দপ্তরে তাঁকে মধ্যরাত পর্যন্ত আটকে রেখে ছেড়ে দেওয়া হয়। সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রামের আন্দোলন ক্ষতিকারক হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিদেশি বামেরা আটকে রাখত। পশ্চিমবঙ্গবাসীর একটা বড়ো অংশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়ানোয় হেরে ভূত হয় সিপিএম। তারা ভাবতেই পারেনি সেই 'খেলো' মমতা একদিন তাদের ধূলিসাৎ করে দেবে।

কর্ণকে বধ করে অর্জুন তার সমস্ত পাপ ক্ষালন করেছিলেন। ২০০৬ সালে তাপসী মালিক হত্যায় অভিযুক্ত হয় সিপিএমের দুই নেতা। তার আগে বানতলায় মহিলাদের ওপর অত্যাচারের প্রধান অভিযুক্তকে আড়াল করে বামেরা। আরজি কর কাণ্ডে অভয়াকে অত্যাচার করে মারার পর তার দেহ হাপিশ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ আর স্থানীয় পৌর প্রতিনিধি। সেই মাতৃগর্ভের লজ্জাটিকে পৌরনেতা বানিয়ে পুরস্কার দেন মমতা। কসবার আইন কলেজে তরুণীর উপর তৃণমূল কংগ্রেসের ছোটো নেতারা যে অশ্লীল অত্যাচার করেছে, তাতে তৃণমূলকে কেউ 'ধর্ষক পার্টি' বলতেই পারে। দীঘা সার্কাসের 'হালাল' প্রসাদ খাইয়েও সে পাপ মিটবে না।

এখন সিপিএম আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চুনোরা সান্ধ্য চ্যানেলে একসঙ্গে বলেন যে, ২০২৬-এর ভোটে বিজেপি-র কোনো সম্ভাবনা নেই। ২০২১ থেকেই লজ্জা আর অপমান মাথায় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একসময়ের ঘরের লোক শুভেন্দু অধিকারীর কাছে হারের চেয়ে ১৯৯০-এ লালু আলমের লাঠি মমতার কাছে অনেক আরামের। কংগ্রেস ভেঙে উপদল গড়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলকে টিকিয়ে রাখাই আজ তার কাছে একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। তাই এখনই উত্তরসূরী বানাতে নারাজ তিনি। হিন্দু বাঙ্গালির কাছে 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি পুরীকেন্দ্রিক। বিজেপির 'জয় শ্রীরাম'-এর পালটা হিসেবে মমতা তা আমদানি করতে চান। কোনো সুস্থ ভাবনার মানুষ এই কৌতুকে আগ্রহ দেখাবেন না।

ইতিমধ্যেই বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের লক্ষ্যে 'স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন'-এর ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গেও অদূর ভবিষ্যতে এই পদ্ধতিতে হতে পারে ভোটার তালিকা সংশোধন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিরে সংক্রান্তি। গোদের উপর বিষফোঁড়া দীঘার সার্কাস। আনুমানিক ৪০ শতাংশ ভোটার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মিম বানানোর চরিত্র ভাবেন। কৌতুকাভিনেতা। কোনো গুরুত্ব নেই। সেই ফাঁদ পেতে মমতা দু'টি বড়ো নির্বাচন জিতেছেন। বিরোধীদের বোকা বানাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের লোকেরা তার মিম বানিয়ে নেতিবাচক প্রচার করেন। ফলে কবিগুরুর ট্র্যাজিক হিরো কর্ণের মতো তিনিও বাঙ্গালি মনে হয়ে ওঠেন সেই ট্র্যাজিক নেত্রী, যিনি 'অবাঙ্গালি, বহিরাগত, হিন্দিভাষী' বিজেপি-র বিরুদ্ধে একাই লড়ছেন। যেমন লড়েছিলেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, বিদেশি সিপিএম নয়। এই প্রহসন কাটাতে হবে। তাতেই প্রাণপ্রতিষ্ঠা পাবেন প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব। তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্কাসে তৈরি জগন্নাথদেব নন। এটা দেখার, ২০২৬-এই মমতার রাজনৈতিক খেলার শেষ হয় কিনা। আর ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকলেও ক্ষেত্রজ্ঞরা সক্রিয় কিনা?

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

এরাজ্যে গণতন্ত্র নয়, '...তন্ত্র' চলছে

প্রশ্রয়দাত্রীষু দিদি,

গণতন্ত্র নয়, রাজ্যে ধর্ষণতন্ত্র চলছে। আর সবের মূলে দিদি আপনি। আপনার অনুগত ভাই হয়েও আজ একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে বারে বারে ধর্ষণকে ছোটো করে দেখিয়েছেন আপনি। তাতেই তো সবাই প্রশ্রয় পেয়েছে। আজ আপনার পরিবারের মেয়েকেই ধর্ষণ। চুপ থাকুন দিদি, চুপ থাকুন। সেটাই ভালো।

কসবার ওই আইন কলেজের ছাত্রী তো কন্যাশ্রী পেয়েছিল। রূপশ্রী। তৃণমূল করে। আপনার আদর্শে চলা আপনার ঘরের মেয়ে, আপনারই বোন। আপনাকে দিদি বলেই ডাকে। আপনিই তো বলেন, আপনার কোনো পরিবার নেই। তৃণমূল কংগ্রেসই আপনার পরিবার। আর যে গণধর্ষণের মাথা সেই ম্যাঙ্গো আবার আপনার পাড়া কালীঘাটের ছেলে। ভাইপোর সঙ্গী। কালীঘাট থানায় নাকি তার দারুণ দাপট। সেও আপনারই পরিবারের ছেলে। ধর্ষণে সাহায্যকারীরাও আপনার পরিবারের। এই ধর্ষকদের মাথার উপরে হাত রাখারাও আপনার পরিবারের। কেমন লাগছে! নির্যাতিত আমারও বোন। কিন্তু এই প্রথম আপনার পরিবারের কেউ। এতদিন বিরোধীদের মা, বোন নির্যাতিতা হলে আপনি মানতেই চাননি। এবার?

পশ্চিমবঙ্গে হুমকি, ধর্ষণের আবহ ও দৌরাত্ম্য যে অপ্রতিহত তা আবার প্রমাণ করে দিল কলেজের মধ্যেই দাদাদের হাতে এক ছাত্রীর গণধর্ষণ। শুনছি, প্রধান অভিযুক্তের অপরিমিত প্রতাপ থেকেই কলেজ চত্বরে নারী-নিগ্রহের অকল্পনীয় ঔদ্ধত্য। ঘটনার বিবরণ আরজি কর ঘটনাকে মনে করাচ্ছে। দুই ক্ষেত্রেই দুষ্কৃতীদের ঔদ্ধত্যের মূল খুঁজতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে তাদের একই প্রত্যয়— পুলিশ ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা তাদের কেশাগ্র ছুঁতে পারবে না। এটাই হলো রাজ্যে ধর্ষণতন্ত্রের প্রমাণ।

মেডিক্যাল কলেজে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হলেও, আরজি করের পড়ুয়া-চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের সঙ্গে ওই দূষিত পরিবেশের সব সম্পর্ক অস্বীকার করেছেন আপনি। অথচ সম্পর্ক আছে। সরকারি শিক্ষাক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্রকে দলীয় দুর্বৃত্তের মুক্তক্ষেত্র করে তোলাই তো ধর্ষণ-খুনের মতো অপরাধেরও সুযোগ করে দেওয়া।

আরজি করের সময়ে ফুঁসে ওঠা রাজ্য বুঝতে পেরেছিল, শাসক দলের ছত্রছায়ায় যারা রয়েছে, তারা যত বড়ো দুষ্কর্মই করুক না কেন, তাদের স্পর্শ করার সাধ্য কারও নেই। প্রাতিষ্ঠানিক বিধি, সরকারি নিয়ম, আইনের ধারা, কোনো কিছুই যেন কিছু নয়, যদি ধর্ষক বা খুনির মাথায় থাকে আপনার হাত। আইন কলেজে ধর্ষণের মূল অভিযুক্তের নাম অতীতে খুন, ধর্ষণ, র‍্যাগিঙের এফআইআর-এ ছিল। তবুও সে কেন কখনো গ্রেপ্তার হয়নি? দিদি, এমন 'দাগি' এক ব্যক্তিকে কোন কারণে কলেজে নিয়োগ করা হয়েছিল? পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা, কলেজ কর্তৃপক্ষের নীরব নতিস্বীকার, এ সবই যৌনহিংসার পথ করে দিয়েছে তাঁকে।

আপনার শাসনকালে কমপক্ষে ১০০ এমন ঘটনা সামনে এসেছে। এগুলো তো দিদি, যারা প্রতিবাদের সাহস দেখিয়েছেন, পুলিশ যাদের অভিযোগ নিয়েছে তাদের তালিকা। শাসকের অত্যাচারের শিকার হয়েছেন এমন আরও অনেক বোন আছে আমার। অনেকে মারা গিয়েছে। অনেকে যন্ত্রণা নিয়ে জীবিত।

আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ থেকে কলেজকাণ্ডে অভিযুক্ত অস্থায়ী কর্মী, সকলের ক্ষমতার উৎস তো আপনি। আপনার দল দিদি। নিরাপত্তা রক্ষীর ঘরেই যে মারধর, নির্যাতন হলো এক নিরপরাধ মেয়ের উপর, তা যেন প্রতীকী। বুঝিয়ে দিল ওই কলেজের নিরাপত্তা রক্ষীর মতো এই রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষীর ঘরও আর নিরাপদ নয়। রক্ষীর ভূমিকা কী?

পার্ক স্ট্রিট কাণ্ড থেকে কামদুনি রক্ষী বলেছেন, 'ছোটো ঘটনা'। হাঁসখালিতে রক্ষীই প্রশ্ন তুলেছেন, ধর্ষিতা সম্পর্কে। মনে আছে দিদি! ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে নদীয়ার হাঁসখালিতে একজন নাবালিকাকে ধর্ষণ করে হত্যা করে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের ছেলে ব্রজগোপাল গোয়ালা। পরে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য সমর গোয়ালা জোর করে দেহ সৎকার করে দেন। দিদি আপনি শুনে কী বলেছিলেন? বলেছিলেন, রেপড নাকি প্রেগন্যান্ট, নাকি লাভ অ্যাফেয়ার্স বলবেন! হ্যাঁ দিদি, আপনি মদত দিয়েছেন। আপনার প্রশ্রয়েই গত ১৪ বছরে রাজ্যে ধর্ষণ চলেছে ধারাবাহিক ভাবে।

আপনার শাসনকালে কমপক্ষে ১০০ এমন ঘটনা সামনে এসেছে। এগুলো তো দিদি, যারা প্রতিবাদের সাহস দেখিয়েছেন, পুলিশ যাদের অভিযোগ নিয়েছে তাদের তালিকা। শাসকের অত্যাচারের শিকার হয়েছেন এমন আরও অনেক বোন আছে আমার। অনেকে মারা গিয়েছে। অনেকে যন্ত্রণা নিয়ে জীবিত। প্রতিটি ঘটনায় আপনার দল বলেছে 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা'। আর কত ধর্ষণ হলে তবে সেটাকে নিরবিচ্ছিন্ন বলা যাবে, বলে দেবেন দিদি!

দিদি, এটা মেনে নিতেই হবে, আপনার প্রশ্রয়েই রাজ্যে ধর্ষণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

ভারত বিরোধিতায় কি মাত্রাছাড়া হবেন ইউনুস?

একমাত্র চরমতম ভারত বিরোধিতাই বাংলাদেশে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার পক্ষে সহায়ক হতে পারে। এটা মাথায় রেখেই বাংলাদেশকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে হয়তো জোর দেবেন ইউনুস।

গত ২৪ মে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনের প্রধান উপদেষ্টার দ্বারা মঞ্চস্থ হয় তার পদত্যাগের একটি কুনাট্য। এই নাটকের মাধ্যমে তিনি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, চাপের মুখে নুইয়ে পড়ার মতো ব্যক্তি তিনি নন। তার ন'মাসের নেতৃত্বে নানা কিছুর সাক্ষী থেকেছে বাংলাদেশ। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এবং এনজিও আইকন বা বেসরকারি, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা খ্যাত ব্যক্তি মহম্মদ ইউনুসকে আগামীদিনে দেশের ত্রাণকর্তা হিসেবে ভেবে স্বাগত জানিয়েছিল বাংলাদেশ। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ঘুচে গিয়েছে সেই ভাবমূর্তি। ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থকারী, ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন একজন ধূর্ত ব্যক্তি হিসেবে বর্তমানে আত্মপ্রকাশ করেছেন ইউনুস। রাজনৈতিক ভিত্তির অভাব এবং জনপ্রিয়তার গ্রাফ নিম্নগামী হওয়া সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিয়ে ক্ষমতা আঁকড়ে রয়েছেন ইউনুস। গদিতে টিকে থাকার উদ্দেশ্যে ইউনুসের এহেন কৌশলের কারণে বাংলাদেশকেও চরম মূল্য দিতে হচ্ছে।

বাংলাদেশকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলছে নানা রাজনৈতিক সংকট। এই সাম্প্রতিক সংকটের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের সময়সূচি। এই নির্বাচনের মাধ্যমেই ঢাকায় একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা। এরই মধ্যে ঘটে চলেছে নানা বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক ঘটনা। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ২০২৫ সালের শেষের দিকে নির্বাচন করানোর ব্যাপারে বিশেষ জোর দিয়েছে। এই দাবিকে জোরালোভাবে সমর্থন করেছে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, লন্ডনে বসে বিএনপি-কে নেতৃত্ব দিচ্ছে বেগম খালেদা জিয়া পুত্র তারেক রহমান। এদিকে ইউনুস বলেছেন যে, ২০২৬ সালের জুন মাসের শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার আনা তার লক্ষ্য। এর সঙ্গে হাসিনা সরকারের যেসব নেতা-মন্ত্রী গ্রেপ্তার হয়েছেন তাদের বিচারের আওতায় আনা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। গত বছরের আগস্ট মাসের পর বাংলাদেশে আবির্ভাব ঘটেছে একটি নতুন রাজনৈতিক দলের। দলটির নাম হলো— ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি। অনেকেই দলটিকে উপহাস করে 'কিংস্ পার্টি' (রাজার পার্টি) বলছেন। বাংলাদেশে বর্তমানে ক্ষমতাসীন এই শাসক দলটির নেতা-কর্মীরা আগামী পাঁচ বছর ইউনুসেরই ক্ষমতায় থাকা উচিত বলে সম্প্রতি মতপ্রকাশও করেছে।

নির্বাচনী নির্ঘণ্ট নির্ধারণের এই লড়াইয়ের পিছনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লুকিয়ে রয়েছে। সেনাবাহিনী ও বিএনপি-র চোখে ইউনুস হলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব, যার কাঁধে একটি বড়ো দায়িত্ব বর্তমানে ন্যস্ত। অবাধ, সুষ্ঠু এবং সব পক্ষের অন্তর্ভুক্তিমূলক একটি নির্বাচন সংঘটন হলো এই মুহূর্তে ইউনুসের মূল করণীয়। কমপক্ষে এক দশক অবাধ নির্বাচন দেখেনি বাংলাদেশ। দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে ইউনুস প্রশাসন সহায়ক হবে বলে মনে করে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী। হাসিনা-পরবর্তী অধ্যায়ে প্রাথমিকভাবে সরকারি ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নেয় সেনা। এরপর হাল ধরেন ইউনুস। এই পর্যায়ে ইউনুস প্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কে সেনাবাহিনীর যা ধ্যানধারণা, তার থেকে এটা স্পষ্ট যে, সেনা মনে করে বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রণয়নের ব্যাপারে বাংলাদেশে আগামীদিনে একটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত, জনপ্রিয় সরকার বিশেষ প্রয়োজন।

একটি সরকার গঠনের লক্ষ্যে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করানো হলো ইউনুসের দায়িত্ব। এই প্রেক্ষিতে তার ভূমিকা অত্যন্ত সীমিত হওয়ার কারণে বাংলাদেশের উদ্ধারকর্তা হিসেবে তিনি নিজের 'মসিহা' রূপী যে চিত্রটি তুলে ধরছেন, তা তার ওপরে ন্যস্ত দায়িত্বের সঙ্গে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তার নেতৃত্বাধীন প্রশাসনের প্রেস সচিবের বক্তব্য অনুযায়ী, পূর্ববর্তী সরকারগুলির সমান ক্ষমতা ভোগ করে অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন। বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদে ইউনুসের সহকর্মী রিজওয়ানা হাসান কিছুটা উদ্ধতভাবেই বলেছেন যে, কেবলমাত্র নির্বাচন করানোর জন্যই তারা নিযুক্ত হননি। ইউনুসের ভাষায়, তার আসল অ্যাজেন্ডা হলো বাংলাদেশের 'রিসেট'। অর্থাৎ, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিনি বাংলাদেশকে 'নতুন পথে' পরিচালিত করতে চান। 'নতুন ভাবে' তারা সবকিছু শুরু করার পক্ষপাতী।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনের প্রধান উপদেষ্টা ইউনুস ও তার দ্বারা নিযুক্ত অন্যান্য উপদেষ্টাদের নতুন ভাবে পথ চলার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি। চট্টগ্রাম বন্দরের বেসরকারীকরণও এর অন্তর্গত। এই উপদেষ্টারা ছাড়া প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্যরা নানা ক্ষেত্রে আরও মহান চিন্তাধারা পোষণ করেন! এইসব বড়োসড়ো ধারণা নিয়ে তারা রীতিমতো মাঠে নেমে পড়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান। বাংলাদেশ হতে মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশ পর্যন্ত বিতর্কিত 'মানবিক করিডোর'টি তারই প্রস্তাবিত। বাংলাদেশের অনেকেই এই করিডোরটিকে তাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সরাসরি মার্কিন হস্তক্ষেপের সূচনাপর্ব হিসেবে দেখছেন। সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দখলদারির ব্যাপারেও

বাংলাদেশের ভিতর মার্কিনি হস্তক্ষেপের প্রসঙ্গ তুলে সরব হয়েছিলেন শেখ হাসিনা। আসন্ন বিপদ সম্পর্কে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন সতর্কবাণী। এর বিপ্রতীপে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে চীন-প্রভাবিত বাজারের অন্তর্ভুক্ত করার মতো হাস্যকর ও অর্থহীন পরিকল্পনা নিজের মনে লালন করেন ইউনুস। স্ট্র্যাটেজিক বা কৌশলগত ক্ষেত্রে নির্বোধ ইউনুস প্রণীত এই নীতিটি প্রকাশ্যে আসতেই কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে নয়াদিল্লি। কৌশলগত বিষয়ে ইউনুসের এহেন অদ্ভুত মতপ্রকাশ দু'দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য রদ করার ক্ষেত্রে বস্তুত নয়াদিল্লিকে বাধ্য করেছে। এর পরিণামস্বরূপ, বাংলাদেশি রপ্তানিকারীদের এখন প্রায় দু'হাজার কোটি টাকার অতিরিক্ত ব্যয় বহন করতে হচ্ছে।

গত ২৫ মে সংস্কারপন্থী কয়েকটি ছোটো ছোটো রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ইউনুস। তাদের সামনে কেন তিনি পদত্যাগ করতে চান তার ব্যাখ্যা দেন। এই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে চতুরতার সঙ্গে ভারতের দিকে আঙ্গুল তোলেন ইউনুস। টেনে আনেন 'ভারতীয় আধিপত্যবাদ'-এর প্রসঙ্গ। তার মতে, আওয়ামি লিগ নিষিদ্ধ হওয়ার পর থেকে তার জীবন দুর্বিষহ করে তোলার লক্ষ্যে হাত ধুয়ে নেমে পড়েছে ভারত।

ভারতকে 'খলনায়ক' প্রতিপন্ন করার এই প্রয়াসটি নিঃসন্দেহে ভালো! এক কথায় দারুণ! কারণ এহেন রাজনৈতিক বক্তব্য ও ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত নানা পরিভাষা নিশ্চিতভাবেই ইউনুসকে বাংলাদেশের একটা বড়ো অংশ এবং জামায়াত-ই-ইসলামির কাছে প্রবল জনপ্রিয় করে তুলবে। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্য ঝেড়ে ফেলতে যারা আগ্রহী, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস এবং সেই মুক্তিযুদ্ধের যাবতীয় নিদর্শন যারা মুছে ফেলতে চায়, তাদের আবেগকেও উসকে দেয় ইউনুসের এহেন কথাবার্তা। তাদের জন্য এ ধরনের বক্তব্য যথেষ্ট উৎসাহবর্ধক।

তবে ভারতের নিন্দা-সমালোচনা হলো ইউনুসের আস্তিনের তাস। এই রিজার্ভ কার্ডটি সম্ভবত এখনই খেলবেন না তিনি। বিএনপি ও সেনাবাহিনীকে ক্ষমতার কেন্দ্র হতে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য এই মুহূর্তে ইসলামপন্থী, মোল্লাবাদীদের সঙ্গে এক ভয়ংকর দর-কষাকষির খেলায় নেমেছেন ইউনুস। আগামীদিনে কিছু 'সংস্কার' হয়তো জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হতে পারে যার ফলশ্রুতিতে ধ্বংস হতে পারে ১৯৭২ সালে গৃহীত বাংলাদেশের সংবিধানের মূল কাঠামো। ১৯৭১-এর যুদ্ধাপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জেহাদি, রাজাকার আজহারুল ইসলামকে সম্প্রতি মুক্ত করেছে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট। তার মৃত্যুদণ্ড মকুব এবং জেলমুক্তির ক্ষেত্রে নির্লজ্জভাবে প্রভাব খাটিয়েছে বাংলাদেশ প্রশাসন। সমগ্র বিশ্ব যেখানে সন্ত্রাসবাদ নির্মূলীকরণের পথে হেঁটে চলেছে, সেখানে তার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি চিত্র বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ইদানীং ফুটে উঠছে। সময়ের গতির উলটো দিকে হেঁটে চলেছে বাংলাদেশ। জঙ্গি আজহারুলের মুক্তি তারই উদাহরণ।

স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতাসম্পন্ন স্বতন্ত্র দু'টি ধারার মিলন ইউনুসকে এনে দিতে পারে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস। তবে অস্থির অর্থনীতি, উন্মত্ত জনতা দাপিয়ে বেরানোর ফলে দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ভয়ভীতির পরিবেশ, রাস্তাঘাটে তাদের অলিখিত শাসন কায়েম হওয়া বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশে সংকটের কালো মেঘকে প্রতিনিয়ত ঘনীভূত করে তুলছে। স্থানীয় স্তরে চাঁদা আদায়ের রাজনীতি এবং তোলাবাজির সীমাহীন জুলুমের কথা তো কহতব্যই নয়। এই পরিস্থিতিতে যত দিন এগোবে, দ্রুত নির্বাচন করানোর দাবি জোরালো হয়ে উঠবে। অচলাবস্থা থেকে মুক্তি চাইবে জনতা। অবস্থা বেগতিক বুঝলে ইউনুসের সামনে শেষ বিকল্প থাকবে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন। তার আগে পর্যন্ত ক্ষমতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে মরিয়া প্রয়াস জারি রাখবেন ইউনুস।

বাংলাদেশ জুড়ে সংঘটিত সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর সূত্র ধরে তার সঠিক বিচার-বিশ্লেষণ সত্যিই কঠিন। এই পরিস্থিতি আগামীদিনে কী আকার ধারণ করবে তা অনুমান করাও আজ বেশ দুরূহ একটি কাজ। একটি 'যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি' তৈরি করতে চাইছে ইউনুস প্রশাসন। প্রতিনিয়ত নানা উস্কানিমূলক মন্তব্য করে চলেছেন ইউনুস। ক্রমাগত তিনি তুলে চলেছেন যুদ্ধের জিগির। অনবরত দিচ্ছেন বিভিন্ন ডাক। তার এইসব আহ্বানের মধ্যে রয়েছে নানা অশুভ সংকেত। ঢাকার রাজনৈতিক অচলাবস্থা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে ইউনুসকে হয়তো ভারতকে প্ররোচিত করতে দেখা যেতে পারে। সেই প্ররোচনায় পা দিয়ে ভারত যাতে প্রত্যাঘাত করে সেটাই হয়তো ইউনুস চাইবেন। সেই ক্ষেত্রে হয়তো চরম ভারত বিরোধী অবস্থান নেবেন ইউনুস। কারণ একমাত্র এই চরমতম ভারত বিরোধিতাই বাংলাদেশে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার পক্ষে সহায়ক হতে পারে। এই পদ্ধতিতে বাংলাদেশকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে হয়তো জোর দেবেন ইউনুস।

ইউনুস যা ভেবে বা আশা করে এই পদক্ষেপ নেবেন, তার ফলাফল সম্পূর্ণ বিপরীতও হতে পারে। আগামীদিনে এর হয়তো এক ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করে রয়েছে।

(লেখক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক এবং রাজ্যসভার পূর্বতন সাংসদ)

শোক সংবাদ

জলপাইগুড়ি নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা অখিল ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের পূর্বতন রাজ্য সভাপতি নগেন্দ্রনাথ বর্মন গত ২৬ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তিনি জলপাইগুড়ি শিশুমন্দিরের পারিচালন সমিতির সদস্য ছিলেন।

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দুর্বলতাকে জয় করতে পারলে অবক্ষয়ের গ্লানি ঘুচবে বাঙ্গালির

পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা থেকে বাংলাদেশের কুমিল্লার মুরাদনগর। সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে দুই হিন্দু বাঙ্গালি নারীর উপর চূড়ান্ত অত্যাচার ও যৌন নির্যাতনের ঘটনা। কলকাতার ক্ষেত্রে নির্যাতিতার পক্ষ থেকে দায়ের হয়েছে চার পৃষ্ঠার একটি অভিযোগপত্র। এমন ভয়ংকর লেখা যা পড়ে শোনানো যায় না। মুরাদনগরের ঘটনায় ছড়িয়ে পড়েছে একটি ভয়ংকর ভিডিয়ো, যা আইসিস (ইসলামিক স্টেট)-ও দেখলে লজ্জা পাবে। কিছুদিন আগেই সবাই পেরেছে যে গত ১৪ বছর সন্দেশখালিতে কীভাবে রাতের পর রাত শেখ শাজাহানের লোকজন হিন্দু বাড়ির মেয়েদের রাতে তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁদের যৌন নির্যাতন করত। তিনটি জায়গাতেই একটা ব্যাপার সমান। তা হলো এই নারীদের বিচার পাওয়ার কোনো জায়গা নেই।

কিন্তু কোথায় যাবে হিন্দু বাঙ্গালি নারী? কার কাছে যাবে? রাজ্য সরকার? কেন্দ্রীয় সরকার? পুলিশ? সিবিআই? বিচারব্যবস্থা? বিদেশমন্ত্রক? কেন্দ্রীয় মহিলা কমিশন? রাজ্য মহিলা কমিশন? বুদ্ধিজীবী? ছাত্রসমাজ? শিক্ষক সমাজ? 'বাংলার মেয়ে'? কার কাছে বিচার চাইবে বাঙ্গালি নির্যাতিতারা? ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী আইন-শৃঙ্খলা রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়।

এই নির্যাতিতারা যায়ওনি কারও কাছে। আসলে কারুর কাছে গিয়ে লাভ নেই। দুর্বলকে কেউ সাহায্য করে না। গাজায় ৫০০০ জন মারা গেলে বাম-ইসলামিকরা ছাড়া কেউ বিশেষ কান্নাকাটি করে না, কিন্তু ৫ জন ইহুদি মারা গেলে ওয়াশিংটন ডিসি তাদের যুদ্ধবিমান পাঠিয়ে দেয়। কারণ গাজাবাসীর কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু ইহুদিরা শিক্ষিত, অর্থবান, চরিত্রবান, শক্তিশালী। নিজেদের জাতিসত্তা সম্পর্কে তাঁরা বিশেষভাবে অবহিত। আর গত ১০০ বছরে অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের হারিয়ে যাওয়া এবং তার পরিবর্তে কমিউনিস্ট পার্টির উত্থান বাঙ্গালি জাতির শিক্ষা, চরিত্র, আর্থিক অবস্থা, জাতিসত্তাবোধ এমন তলানিতে এনে দাঁড় করিয়েছে যে, একসময় লন্ডনের পর বিশ্বের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্র হয়ে ওঠা কলকাতা আজ তার মেয়েদের রক্ষা করতে অক্ষম। বাঙ্গালিকে অনেক শক্ত হতে হবে। চাই অর্থ, ব্যবসাবাণিজ্যে উন্নতি। চাই শক্তি, একতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা। আমলাতন্ত্রে, জাতীয় সংবাদমাধ্যমে বাঙ্গালি প্রতিনিধির সংখ্যাবৃদ্ধি প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে নেতৃত্বদানে অগ্রণী হতে হবে বাঙ্গালিকে। বাঙ্গালির নিজস্ব ব্যাংক প্রয়োজন। এর সঙ্গে প্রয়োজন মেধা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বিভিন্ন স্তরে প্রতিনিধি কি নেই? আর কোথাও না থাকুন সংবাদমাধ্যমে তো আছে? উত্তর হলো, আছে। কিন্তু কর্মচারী হিসেবে। মালিক হিসেবে নয়। যারা কর্মচারী হিসেবে রয়েছে, তারা নামেই বাঙ্গালি, চিন্তা-চেতনায় কমিউনিস্ট। নিজস্ব জাতিসত্তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ প্রাণী তারা।

বাঙ্গালিকে বুঝতে হবে তাঁরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে গত ৪৮ বছরে। বাংলাদেশ-মায়ানমার থেকে অনুপ্রবেশ হয়েছে মাত্রাছাড়া। পরিণামে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ডেমোগ্রাফি গিয়েছে পালটে। রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার হাল তথৈবচ, অথচ বাংলাদেশি-রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওবিসি কোটা দিয়ে তাদের জন্য শিক্ষা, চাকরিতে সরকারি আসন সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে গত ১৭ বছর ধরে। বাঙ্গালির ব্যবসার জগতের দখল নিয়েছে ভিন রাজ্যের লোক আর বাংলাদেশিরা। অধিকাংশ হিন্দু বাঙ্গালির হাতে টাকা নেই, ক্ষমতা নেই, কিন্তু অহংকার আছে যোলো আনার উপর আঠেরো আনা। অন্যের দুঃখে রোজ চোখের জল ফেলে বাঙ্গালি। গাজার জন্য চোখের জল না ফেলে আয়নার সামনে একবার দাঁড়িয়ে তাদের দেখা উচিত যে আজ তারা কোথায়। গাজার জন্য সারা পৃথিবীর বহু লোকজন কাঁদছে। মিথ্যা জমিদারির অহংকার আয়নার সামনে দাঁড়ানোর অধিকার থেকে বাঙ্গালিকে বঞ্চিত করছে না তো? আর ক'দিন 'জলসাঘর'-এর ছবি বিশ্বাসের মতো নিজের শেষ আসছে জেনেও নির্বিকার থাকবে হিন্দু বাঙ্গালি?

অনুশীলন সমিতির ধাঁচে বাঙ্গালি সমাজ গড়ে তোলা বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষায় থাকা উচিত সকলের সমানাধিকার। আবহমান কাল ধরে রাজার পুত্র অন্যদের সঙ্গে একত্রে শিক্ষাগ্রহণ করত। এটিই সনাতন ভারতবর্ষের পরম্পরা। বর্তমানে বাঙ্গালির সেই শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজন। যাতে একটি শিশু তার পরিবেশ, সমাজকে চিনতে পারে। এর সঙ্গে প্রয়োজন আত্মজ্ঞান, শারীরিক শিক্ষা। মনের মধ্যে তৈরি হওয়া কাপুরুষতা বর্জন করতে হবে। ইহুদিরা যদি তাঁদের নারীদের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে সারা পৃথিবীকে রাস্তায় নামাতে পারে, তবে কোন কাপুরুষতা বাঙ্গালির হাত-পা বেঁধে রেখেছে? স্বামীজী, ঋষি অরবিন্দ, স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজকে কি ভুলে গিয়েছে বাঙ্গালি? অবক্ষয়ের তলানিতে পৌঁছে গিয়েছে আজ বাঙ্গালি। উঠে তাঁদের দাঁড়াতেই হবে। বাঙ্গালি হলো বীর জাতি। স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের পরম্পরার সন্ন্যাসী স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজের উপর হওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে কোন কাপুরুষতা আজ বাঙ্গালিকে বাধা দিচ্ছে? যে সন্ন্যাসী 'আনন্দমঠ'-এর স্বামী সত্যানন্দর মতো বাঙ্গালি যুবকদের ভিতরের বীরকে জাগিয়ে তুলেছেন, যিনি বাঙ্গালির সম্মুখে জাতিসত্তাবোধের আয়না তুলে ধরেছেন, কেন সমাজের অধিকাংশ মানুষ আজ তাঁর পাশে দাঁড়াতে পারছে না? বাঙ্গালির গভীর চিন্তন-মনন প্রয়োজন। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলে বাঙ্গালি আগামীদিনে অবশ্যই জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করবে। □

পশ্চিমবঙ্গে জেহাদিদের ভয়ে পুলিশ নিজেই আজ আতঙ্কিত

মণীন্দ্রনাথ সাহা

পশ্চিমবঙ্গের আকাশ আজ শাসকদলের দুর্নীতির কালো মেঘে আচ্ছাদিত। বিষাক্ত হয়ে গিয়েছে মানুষের মন। সামাজিক সম্পর্কগুলি ক্লিশে হতে হতে এমনই হয়ে উঠেছে যে, আজ তারা পাশের বাড়ির আপদে বিপদেও নির্লিপ্ত। এই সবকিছুর জন্য দায়ী এরাজ্যের সর্বগ্রাসী রাজনীতি। তাই পরিবর্তন ছাড়া পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচানোর কোনো পথ আর নেই। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির বর্তমান অভিমুখ এক লাগামছাড়া, বাঁধনহীন ও বিকারগ্রস্ততায় ভরপুর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এরাজ্যের রাজনীতি অভিযোজন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই সে পথ আঁকড়ে ধরেই একইভাবে শাসনরথের গতিকে ধরে রেখেছে। সঙ্গে শুরু করা হয়েছে জেহাদিদের দ্বারা হিন্দুদের ওপর আক্রমণের ব্যাপক চক্রান্ত।

শুরু করেছে মালদহ দিয়ে। তারপর মুর্শিদাবাদ হয়ে মহেশতলায় পৌঁছেছে। কী আশ্চর্য মিল তাই না? তিনটি জায়গার নামের প্রথম অক্ষর 'ম' দিয়ে শুরু। আবার অপরাধীরা অপরাধ করছে 'ম'-এ মমতার শাসনকালে। উপরন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই আক্রমণকারীরা গোদা বাংলায় যাকে বলে মুসলমান আর আক্রান্তরা হিন্দু। এছাড়া অপূর্ব মিল রয়েছে মমতার সঙ্গে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী শাসক মহম্মদ ইউনুসের। দুই শাসক যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। উভয়ের লক্ষ্য হিন্দু নির্যাতন, হিন্দু নিধন, হিন্দুদের প্রতি প্রবল ঘৃণা।

এইসব হামলার প্রতিবাদে বঙ্গীয় হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চের পক্ষ থেকে এরাজ্যে হিন্দুদের সুরক্ষার দাবিতে গত ১৭ জুন তুলসী সম্মানযাত্রা সম্পন্ন করেছে। তুলসীমঞ্চ নিয়ে মিছিলে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন অংশ নিয়েছে বঙ্গীয় হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চের আহ্বানে।

কয়েকদিন আগে মহেশতলায় জেহাদিদের হামলায় আক্রান্ত হয় হিন্দুরা। একটি মন্দিরের পাশে থাকা তুলসীমঞ্চ ভেঙে ফেলা হয়। জেহাদিদের ব্যাপক তাণ্ডবের সাক্ষী থাকে মহেশতলার রবীন্দ্রনগর থানা এলাকা। দোকানপাট ভাঙচুরের পাশাপাশি থানার পাশে থাকা মোটরবাইক জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। অশান্তি থামাতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছে পুলিশও। পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর, পুলিশ কর্তাদের লক্ষ্য করে ইট-পাথর ছোঁড়া হয়েছে। পাথর ছোঁড়া হয়েছে হিন্দুদের বাড়িতেও। মালদহ থেকে মহেশতলা প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুলিশ থেকেছে নীরব দর্শকের ভূমিকায়।

ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে করে তুলসীমঞ্চ নিয়ে মিছিল করে রাজভবন পৌঁছান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি বঙ্গ বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও তুলসীমঞ্চ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়ির সামনে প্রতিবাদ করে গ্রেপ্তারবরণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মনে করে পুলিশের পিটুনি খাওয়া শুধু পুলিশের লজ্জা নয়, এ লজ্জা শাসকেরও। কারণ পুলিশকে মেরুদণ্ডহীন করে তোলার পিছনে সবচেয়ে বেশি দায়ী এই শাসকই।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে হিন্দুদের ওপর হামলা চালানোর সাহস পাচ্ছে কোথা থেকে রাজ্যের জেহাদিরা মুসলমান? এ প্রশ্নের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনেকেই বলছেন— বহুদিন আগে বলা পাকিস্তানি নাগরিক এক্রামুল্লার মতে— 'ভারতের মধ্যে পঞ্চমবাহিনীর সাহসেই জেহাদিরা বলীয়ান। তার প্রমাণ পাওয়া গেছে সাম্প্রতিক অতীতে পাকিস্তানের সংসদে আলোচনা থেকে। সেখানে বলা হয়েছিল— 'যতদিন ভারতে অখিলেশ যাদব, কংগ্রেস, সিপিএম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মানুষ এবং দলের লোকেরা থাকবে ততদিন পাকিস্তানের কোনো চিন্তা নেই।' এছাড়া বাংলাদেশে শেখ হাসিনার আমলে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত জঙ্গি হিজবুত তাহেরি মহম্মদ ইউনুসের আমলে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর প্রকাশ্যে বলেছে--- 'আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করব, তিনি ভারত থেকে পশ্চিমবঙ্গকে স্বাধীন করার জন্য ভারত সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করুন। আমরা আপনাকে সবরকম সাহায্য করব।' এখানে আরও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এরাজ্যের জেহাদিরা কাদের জন্য এত সাহস পায়?

কিন্তু এরাজ্যে সবচেয়ে লজ্জার যে বিষয়টি তা হলো পুলিশের ভূমিকা। ২০১১ সালের পর থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে জেহাদিদের দ্বারা পুলিশ যেভাবে আক্রান্ত হয়েছে তা নজিরবিহীন। সারা বিশ্ব পশ্চিমবঙ্গের পুলিশকে কখনো দেখেছে টেবিলের নীচে লুকোতে, কখনো আলমারির ফাঁকে। কখনো পুলিশের পশ্চাদ্দেশে উড়ন্ত

ফঃ ২

লুঙ্গির ছুটন্ত লাথি পড়তে, কখনো-বা ইট-পাথরের ঘায়ে পুলিশকে রক্তাক্ত হতে। যা অন্য কোনো রাজ্যে ঘটে না। তবুও পুলিশ নির্বিকার। এবারেও দেখা গেছে— পুলিশের লাঠি নিয়ে যেখানে জেহাদিদের দিকে তেড়ে যাওয়ার কথা কিংবা বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়ার কথা সেখানে পুলিশ সাদা রুমাল উড়িয়ে জেহাদিদেরকে শান্তির বার্তা দিতে।

পুলিশের এই করুণ দশা দেখে অনেকেই বলেন, একটা সময় ছিল পুলিশ কর্তব্য পালন করতে গিয়ে মার খেলে সাধারণ মানুষের কষ্ট হতো। এখন কেন জানি না পুলিশ মারখেলে সাধারণ মানুষের মনে সামান্যটুকুও সহানুভূতি জাগে না। হয়তো এরজন্য তারা নিজেরাই দায়ী। কারণ বর্তমানের পুলিশ ভুলেই গেছে যে, তারাও ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ স্তম্ভের একটি স্তম্ভ। অথচ একসময় পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের যথেষ্ট সাহস এবং অপরাধীদের শায়েস্তা করার নজির রয়েছে এই পশ্চিমবঙ্গে। এটা তারা করতে পেরেছে কেবলমাত্র অফিসারদের নির্ভীকতা ও আক্রমণকারীদের থেকে আক্রান্তদের রক্ষায় তাঁদের দৃঢ়চেতা ভূমিকার জন্য। তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে প্রাসঙ্গিক হবে।

(১) ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টে কলকাতায় হিন্দুনিধনের দিন এন্টালি, কড়েয়া, বেনেপুকুর, খিদিরপুর, এলাকার হিন্দু বাসিন্দারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণরক্ষায় কোনো থানার পুলিশের সাহায্য পায়নি। ডিসি ডিডি হীরেন সরকার ডিসি হেডকোয়ার্সের ঘরে গিয়ে জানতে চাইলেন, কেন আক্রান্ত নাগরিকরা পুলিশের সাহায্য পাচ্ছে না? সেখানে কোনো সদুত্তর না পেয়ে হীরেন সরকার দুটি জিপ বোঝাই গুর্খা আর্মড পুলিশ নিয়ে খিদিরপুর চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি আগ্নিসংযোগ ও হত্যায় রত আক্রমণকারীদের 'Shoot to kill' নির্দেশ দিয়ে অবরুদ্ধ অসহায় হিন্দুদের উদ্ধার করে ভবানীপুরে নিরাপদ অঞ্চলে স্থানান্তরিত করলেন। লালবাজারে কন্ট্রোলরুমে হীরেন সরকার ফিরে আসতেই বঙ্গের ক্রুদ্ধ মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দি তাঁর মুখোমুখি। তাঁর প্রশ্ন ছিল— বিনা নির্দেশে হীরেন সরকার কেন খিদিরপুর গিয়েছিলেন? ততোধিক ক্রুদ্ধ হীরেনবাবু জবাব দিয়েছিলেন যে, পুলিশি আইনে নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় তিনি দায়বদ্ধ। সুতরাং ওই দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন মাত্র।

ঠিক এই একই দায়িত্ব কেন নোয়াখালিতে পুলিশ পালন করেনি, সেই প্রশ্ন করেছিলেন গান্ধীজী জেলা শাসককে, ১৯৪৬-এর নভেম্বরে নোয়াখালির মাটিতে পা রেখে।

(২) পুলিশের সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে সমাজের কাছে একটা ভূমিকা, একটা দায়বদ্ধতা আছে এবং এই দায়বদ্ধতা কিন্তু আগাগোড়া ফৌজদারি দণ্ডবিধি আইনে নির্দিষ্ট করা আছে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত থানার বড়বাবুদের স্মরণ রাখা উচিত তাঁদেরই একজন পূর্বসুরির কথা। তিনি ছিলেন মালদহ জেলার গাজোল থানার বড়বাবু মিহিরেশ বর্মণ।

১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসে গাজোল থানার বাবুপুর এলাকায় ফসলের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে গণ্ডগোলের জন্য সিপিএম সমর্থক কয়েকজন ভাগচাষি জমির মালিকের বাড়িতে সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে দু'জন মহিলাকে ধর্ষণ করে এবং এক মহিলা-সহ তিনজনকে খুন করে ওই বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। গাজোল থানার বড়বাবু ধর্ষণ, খুন ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করেন। সিপিআইএম নেতা জ্যোতি বসু তখন দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পার্টির লোকেদের মারফত এই খবর শুনে তিনি সরাসরি মিহিরেশবাবুকে ফোন করেন তাঁর দলের ওই চারজনকে জামিনে ছেড়ে দিতে। মিহিরেশবাবু সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিবাবুকে জানিয়ে দেন, যে অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাতে আইন মোতাবেক জামিন দেওয়া যায় না।

পরে জ্যোতিবাবু স্বরাষ্ট্রদপ্তরের জয়েন্ট সেক্রেটারিকে দিয়ে বড়বাবুকে নির্দেশ পাঠান যে, পুলিশ যেন আদালতে অভিযুক্তদের জামিনের আবেদনের বিরোধিতা না করে। কিন্তু বড়বাবু সেই নির্দেশও পালন করতে অস্বীকার করেন। এর কয়েকদিন পর মিহিরেশ বর্মণকে দ্রুত বদলির নির্দেশ দেন মালদহের পুলিশ সুপার। মিহিরেশবাবু বদলির নির্দেশ পেয়ে হাইকোর্টে যেতে মনস্থ করেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় খবরের কাগজ মারফত খবরটি জেনে মালদহ সফরে যান এবং মিহিরেশবাবুকে মালদহের সার্কিট হাউসে ডেকে পাঠান। অজয়বাবু ঘটনার পুরো সরকারি ফাইলটি দেখে মালদহের পুলিশ সুপারকে মিহিরেশবাবুর বদলির আদেশ বাতিলের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিজে ওই ফাইলে সই করেন। পরবর্তী কর্মজীবনে মহিরেশ বর্মণ তাঁর সেই আইন মোতাবেক দৃঢ়তার জন্য সিনিয়র অফিসারদের কাছে শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন।

(৩) যুক্তফ্রন্ট সরকারের সামনে জ্যোতি বসু পুলিশমন্ত্রী থাকাকালীন রাজা পুলিশের শীর্ষকর্তা ছিলেন উপানন্দবাবু। আজকের মতোই পশ্চিমবঙ্গ তখন রাজনৈতিক হানাহানিতে রক্তাক্ত। কোলিয়ারিতে এক শ্রমিক নেতার খুনের ঘটনায় পুলিশ সিপিএমের কয়েকজন ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করলে ক্ষিপ্ত জ্যোতিবাবু উপানন্দবাবুকে ডেকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কী ব্যাপার? পুলিশ আমাদের লোকজনকে ধরছে কেন?' পুলিশকর্তা উপানন্দবাবু জবাবে বলেছিলেন— 'ধৃতদের নাম এফআইআর-এ আছে। পুলিশ সঠিক কাজই করেছে।' জ্যোতিবাবু পালটা কোনো প্রশ্ন করতে পারেননি।

পুলিশের সঙ্গে প্রশাসন সহযোগিতা করলে এবং পুলিশকে অপরাধ দমনে ব্যবস্থা নেওয়ার স্বাধীনতা দিলে অপরাধীদের শায়েস্তা করার মানসিকতা ও যোগ্যতা বহু পুলিশের মধ্যে এখনো রয়েছে। কিন্তু প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব যদি পুলিশের হাতে বেড়ি পরিয়ে রাখে, তাহলে পুলিশের করার কিছু থাকে না।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মনে করে পুলিশের পিটুনি খাওয়া শুধু পুলিশের লজ্জা নয়, এ লজ্জা শাসকেরও। কারণ পুলিশকে মেরুদণ্ডহীন করে তোলার পিছনে সবচেয়ে বেশি দায়ী এই শাসকই। সাধারণ মানুষ মনে করে স্বকীয়তা বজায় রাখতে এবং নিজেদের ভাবমূর্তি ফেরাতে কড়া পদক্ষেপ নিয়ে এই লজ্জাজনক ঘটনার অবসান ঘটাবে বর্তমান প্রশাসন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরাও পুলিশি আইনের সহায়তায় নিজেদের শিরদাঁড়া সোজা রেখে চলবেন। এটা শুধু রাজ্যের জন্য নয়, গোটা সমাজের জন্যই অত্যন্ত জরুরি। □

সীমাহীন তুষ্টীকরণ রাজনীতির জন্যই পশ্চিমবঙ্গে জেহাদিদের প্রলয়োৎসব

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

শৃঙ্খলের আলস্যশয্যায় পশ্চিমবঙ্গ। ঘোর অমাবস্যার নাট্যশালা পশ্চিমবঙ্গ। অনাচার, অনিষ্ট, অন্যায়, অপরাধ, দুর্নীতি বর্তমানে অস্বাভাবিক হারে তরুপল্লব বিস্তার করেছে। আদর্শহীন শাসনকাল তাই-ই দেয়। এর সঙ্গে মমতা ব্যানার্জির সরকার অতিরিক্ত যে দৌরাত্ম্য যোগ করল তা হলো— জেহাদি মুসলমানদের অন্তহীন তোষণ। মুসলমান ভোটব্যাংককে বাপের সম্পত্তির মতো আগলে রাখার উদ্ভ্রান্ত ভাবোন্মদমত্ততায় বিভোর এই রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থা। জেহাদি তাণ্ডব মোকাবিলায় তারা পুরোপুরি নপুংসক। মোথাবাড়ি ও মুর্শিদাবাদের পর আবারও তার প্রমাণ মিলল মহেশতলায়। গত ১১ জুন মহেশতলা আরও একবার জানান দিল পশ্চিম বাংলাদেশ হতে পশ্চিমবঙ্গের আর দেরি নেই। পকেটে পকেটে তৈরি হচ্ছে মিনি পাকিস্তান। ওইদিন, মহেশতলা পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে রবীন্দ্রনগর থানা লাগোয়া এলাকায় একটি মন্দির কমিটির জমিতে জেহাদিরা অবৈধ ভাবে দখল করে দোকান স্থাপন করতে চায়। হিন্দুরা মুখোমুখি হলে পরিস্থিতি বেসামাল করে মোল্লাবাদীরা। চিরাচরিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যানুযায়ী হিন্দুদের ওপর তারা আক্রমণ চালায়। পবিত্র তুলসী মঞ্চ ভাঙচুর করে। তা এই জেহাদি হিংসা চলাকালীন পুলিশ কী করছিল? জেহাদিদের পদাঘাত আগেও চুপচাপ খেয়েছে দলদাস পুলিশ। সাঁতরাগাছি সংঘর্ষের সেই ভাইরাল ভিডিয়ো ভুলে যায়নি কেউ! সেই ভিডিয়োয় দেখা যায় যে, লুঙ্গি-পরিহিত উদ্দাম এক জেহাদি কর্তব্যরত পুলিশকে পদাঘাত করছে। ঠিক সেই ভাবেই গত ১১ জুন মেটিয়াবুরুজ বিধানসভার অন্তর্গত মহেশতলায় থানা চত্বরে হিংসা ও চরম বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণই করতে পারল না আইসি মুকুল মিয়া এবং এসডিপিও কামরুজ্জামান মোল্লা। থানার পাশে অবাধে ভাঙচুর চললেও পুলিশ থাকল প্রায় নিষ্ক্রিয়।

সংঘর্ষের অনেক পরে পুলিশ যখন একটু অ্যাকশন নেবে ভাবল, তখনই জেহাদিরা পুলিশের বাইকে আগুন লাগায়, ইট ছোঁড়ে। রাজনৈতিক হতাশা, মজহবি তুষ্টীকরণ ঠিক কোন পর্যায়ে পৌঁছালে বারবার এমন ঘটনা ঘটতে পারে! মহেশতলা থানা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে এদিন হিন্দুদের ওপর এইভাবে আক্রমণ চলে এবং পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকে। তারপর বাধ্য হয়ে হিন্দুরা সামান্য সক্রিয় হলেই জেহাদিদের হাতে তারা আক্রান্ত হয়। কলকাতা মহানগর সংলগ্ন অঞ্চলে যদি এই কাণ্ড হয়, তাহলে সহজেই অনুমেয় যে, জেলায়, গ্রামে, সীমান্ত ঘেঁষা অঞ্চলে কী ভয়ানক প্রশাসনিক অসহযোগিতা এবং জেহাদি অত্যাচারে দিন কাটে স্থানীয় মানুষগুলোর। সেখানে তাদের তুলসীমঞ্চ রক্ষা প্রতিদিনের জীবন-মরণ সংঘর্ষের সমান। মমতা সরকার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেওয়ার বিনিময়ে হিন্দুদের, প্রান্তিক অঞ্চলের তুলসীমঞ্চে আলপনা দেওয়া মানুষগুলোর ধর্মরক্ষার সুরক্ষা চিরকালীন রাজনৈতিক সুদ হিসেবে নিচ্ছে। বিরোধী পক্ষ হলেই মিথ্যা মামলা সাজিয়ে পুলিশ আটক করে। মহেশতলায় জেহাদি হিংসায় ক'জন জেহাদি আটক হলো, কী তাদের শাস্তি হলো পশ্চিমবঙ্গবাসী হয়তো জানবে না কোনো দিন।

বহুদিন ধরেই জেহাদিদের মুক্তাঞ্চল এ রাজ্য। কারণ জেহাদিরাই তৃণমূলের ভোট লুটের কারিগর। তারাই পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস বদলের কারিগর। তারাই সন্ত্রাসের কারিগর। তারাই মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থেকে কলকাতার গুলশন কলোনিতে পাকিস্তানপন্থী শক্তি। তারাই চোরা আগ্নেয়াস্ত্র থেকে জাল ভোটার কার্ড সব কিছুর নিয়ন্ত্রক। নানান পদ্ধতিতে তারা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিরও দখল নিচ্ছে। ইসলামিক জঙ্গিদের সবচেয়ে সুরক্ষিত ঠিকানা মমতা সরকারের পশ্চিমবঙ্গ।

এ রাজ্যেই বারবার ধরা পড়ে আল কায়েদা জঙ্গি আবু সুফিয়ান, মইনুল মণ্ডল, লিয়ন আহমেদ, আল মামুন কামাল, আতিউর রহমান, নাজমুল সাকিব, মোশারফ হোসেন, ইয়াকুব বিশ্বাস, মুর্শিদ হাসান। তালিকা অতি দীর্ঘ। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ জঙ্গিঘাঁটি চিহ্নিত করতে ব্যর্থ। ডোমকলের লিয়ন আহমেদ, যে ছিল কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ, সে আসলে একজন কুখ্যাত জঙ্গি। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) হদিশ দিয়েছে

পুলিশের সামনেই এক জেহাদি তুলে ফেলছে তুলসীমঞ্চ।

মোল্লাবাদী শক্তির গোপন কুঠুরি পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু তারপরেও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ জেহাদিদের হাতেই মার খায়। হিন্দুবিরোধিতা হলো এই রাজ্য প্রশাসনের এক অলিখিত অ্যাজেন্ডা। আজকে মহেশতলার ঘটনা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। মমতা ব্যানার্জি সরকারে আসার পর থেকেই তাদের তুষ্টীকরণ রাজনীতি ক্রমে ক্রমে প্রকট হতে থাকে। ২০১৬ সালে দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জন যখন মহরমের জন্য থমকে গেলে মহামান্য কলকাতা উচ্চ আদালতে দায়ের হয় মামলা। আদালতের হস্তক্ষেপের ফলে সিলমোহর পরে এই সরকার হলো তোষণের সরকার। বিচারপতি দীপক দত্তের তীক্ষ্ণ মন্তব্য ছিল— 'a clear endeavor to appease the minorities' এবং সেই পর্যবেক্ষণেই কলকাতা হাইকোর্ট বলে, 'There has been a clear endeavor on the part of the State government to pamper and appease the minority section of the public at the cost of the majority section without there being any plausible justification. The state government has been irresponsibly brazen in its conduct of being partial to one community, thereby infringing upon the fundamental rights of people worshipping Maa Durga...'

জেহাদি তোষণের রাজনীতি হলো তুষ্টীকরণ-আধারিত প্রশাসনের সবচেয়ে বড়ো দুর্নীতি। মুসলমান ফার্স্ট নীতি মমতার অতি পছন্দের। 'Morning shows the day!' মুখ্যমন্ত্রী হতে না হতেই মমতা ব্যানার্জি কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্য স্কলারশিপ ঘোষণা করলেন এবং ৫৪, ১৬৬ জন মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বরাদ্দ অর্থ ছিল ২১.৩৭ কোটি টাকা। ২০১২-তে ঘোষণা করলেন ১০ হাজার মাদ্রাসাতে লোন স্কিমের, যা ২০১৩ সালে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে কলকাতা হাইকোর্ট। সেই থেকে শুরু করে ২০২৪-এ কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে মুসলমান তোষণমুখী ওবিসি সংরক্ষণ বাতিল ঘোষণা— মমতা সরকারের তোষণকে পুনঃ পুনঃ স্পষ্ট করেছে। মানুষ কি ভুলে গেছে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর সেই জেহাদি র‍্যালির কথা? ২০১৪ সালের ২৯ নভেম্বর। ওই দিনই পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন তার আসল রূপ জাহির করে। বর্ধমানে খাগড়াগড় বিস্ফোরণের পর পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসাগুলি যে জঙ্গিদের আঁতুড়ঘর তা প্রমাণিত হয়। এর ফলে জামিয়াত উলেমা-ই-হিন্দ-এর সমর্থকরা এমন চটে যায় যে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর নেতৃত্বে বিগ্রেডে সেদিন শুরু হয় লক্ষ মানুষের জমায়েত বিক্ষোভ। পুলিশ, ফায়ার বিগ্রেড কারোর অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন তারা বোধ করেনি। এমন জমায়েত হয় যে, রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের যাতায়াতের রুট পর্যন্ত গেল বদলে। সিটি অব জয়— সেদিন প্রত্যক্ষ করল জামাতদের হাতে পুলিশ বেধড়ক মার খাচ্ছে। বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট থেকে শহিদ মিনার পর্যন্ত চলে ধুন্ধুমার। এই ঘটনায় ১১ জন পুলিশ আহত হয়। তিনজন আইপিএস অফিসার হন আক্রান্ত। পুলিশের ১৩টি গাড়িতে আগুন লাগানো হয়।

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মহানগরী সাক্ষী থেকেছিল 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এর। সেই গ্রেট ক্যালকাটা কিলার জিন যে এখনও বইছে এবং তাকে বইতে মদত দিচ্ছে এই রাজ্য প্রশাসন, তা সেই জেহাদি র‍্যালির দিনই নিশ্চিত হয়। খোদ কলকাতার বুকে লালবাজার পাড়ায় পুলিশ মার খায় জেহাদিদের হাতে। সেখানে ভাঙ্গড়, মহেশতলা, বাদুড়িয়া, দেগঙ্গা, সমুদ্রগড়, সাঁতরাগাছি, ধুলাগড়, তেলিনিপাড়া তো বিস্ময়ের কিছুই নয়। প্রশাসনের প্রতি বিশ্বাস প্রতিদিন ধুলোয় মিশে যাচ্ছে। এইতো সেদিন, খোদ কলকাতার মৌলালিতে রুটের বাস থামাল জেহাদিরা। পুলিশ থাকল শান্ত ছেলে হয়ে দাঁড়িয়ে। বাসের মাথায় থাকা গৈরিক ধ্বজ খুলতে বাধ্য করা হলো। কখনো দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জনে বাধা, কখনো শ্রীরামনবমীতে প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা, কখনো তুলসী মঞ্চ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া, কখনো কলকাতার বুকে পুলিশ পাহারায় সরস্বতী পূজা— কোনোটাই আর এই রাজ্যের বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। জেহাদিদের দুষ্কর্ম এই রাজ্যে অতি সাধারণ ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গের বাদুড়িয়া, দত্তপুকুর, বসিরহাট, স্বরূপনগর, মোথাবাড়ি, মুর্শিদাবাদে জেহাদি তাণ্ডব এবং তারপরে এই রাজ্যকে 'মিনি পাকিস্তান' আখ্যা দেওয়া মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম যখন দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াক প্রকল্পের এবং তারকেশ্বর ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হন— তখন বুঝতে অপেক্ষা থাকে না যে, এ রাজ্যকে বৃহত্তর বাংলাদেশ তৈরির চক্রান্ত চলছে।

হিন্দু নির্যাতন অব্যাহত থাকায় প্রশাসনও যেন একটা মজা উপভোগ করে। রাজ্যের জেলাগুলিতে জনবিন্যাস বদলের লাল সংকেত, সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে হিন্দুদের জেহাদ বিরোধী দৈনিক সংঘর্ষে ঘনিয়ে ওঠে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয় লুটিয়েনস্ লিবারাল-রা। জ্বলন্ত সংকটেও লিবারাল সেকুলার (মূলত বামপন্থী)-রা কখনো পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনের বিরোধিতা করে না। সংশোধিত নাগরিকত্ব বিল ও আইনের বিরুদ্ধে যখন অপপ্রচার চলে, তখন আবার তৃণমূল, শাহিনবাগ, সিদ্দিকুল্লা, বামপন্থী, উদারপন্থী, নিরপেক্ষপন্থী এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন এক সুরে গায়। এ রাজ্যে 'পুবের কলম'-এর মালিক আহমেদ হাসান ইমরানের যোগ মেলে নিষিদ্ধ সংগঠন জামাত-ই-ইসলামির সঙ্গে। এই ব্যক্তি আবার নিষিদ্ধ সংগঠন স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া বা সিমি-র জন্মদাতা। তাকে রাজ্যসভার সদস্য করে তৃণমূল। পশ্চিমবঙ্গের বুকে দাপিয়ে চলেছে জেহাদি বাড়বাড়ন্ত। তার সামনে বিন্দুমাত্র প্রতিরোধ এলেই ঘটে মহেশতলার মতো ঘটনা।

একথা প্রমাণিত যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার হিন্দুবিরোধী। ২০১০-এ দেগঙ্গা হিংসার মাস্টারমাইন্ড হাজি নুরুল ইসলাম ২০১৬ ও ২০২৪-এ হাড়োয়া বিধানসভা ও বসিরহাট লোকসভায় তৃণমূল প্রার্থী হয়। ২০১৩ সালে ক্যানিং দাঙ্গার শিরোমণি গিয়াসউদ্দিন মোল্লা ২০১৬, ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে মগরাহাট পশ্চিম কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী হয়। ২০১৬ সালের ধুলাগড় দাঙ্গার খল নায়ক গুলশন মালিকও ২০১৬ ও ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে পাঁচলার তৃণমূল প্রার্থী ছিল। ২০২৫ মুর্শিদাবাদ দাঙ্গার মাস্টারমাইন্ড মেহবুব আলমও তৃণমূলের সম্পদ। সে আবার স্থানীয় কাউন্সিলর। কাউন্সিলর থেকে রাজ্যসভার সদস্য, সে জেহাদি হোক বা দাঙ্গামুখী, হিন্দুবিরোধী হলেই প্রশাসন ও তৃণমূলের সম্পদ। এ রাজ্যে প্রশাসন আর তৃণমূল কংগ্রেস সমার্থক। হিন্দুদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় উদাসীনতাই জেহাদিদের পেছনে সবচেয়ে বড়ো প্রশাসনিক মদত। জেহাদিদের প্রতি তৃণমূল এবং তৃণমূলপ্রেমী রাজ্য প্রশাসনের ক্রমাগত মদত ও পক্ষপাতে হিন্দুদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে। মুসলমান ভোটব্যাংক আর ভাতার সাহায্যে ভোটযুদ্ধে আর কতদিন টিকবে মমতা সরকার? সীমাহীন তুষ্টীকরণের নির্বুদ্ধিতা এবং হিন্দু সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্নব্যূহ ঘিরে ধরছে এই সরকারকে। □

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে চলেছে ভারত

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বদেশি উৎপাদন নীতি গ্রহণ করার ফলে এবং মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে ভারত অর্থনীতির অগ্রগতির সঙ্গে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও লক্ষণীয় ভাবে এগিয়ে চলেছে।

আনন্দ মোহন দাস

অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য প্রমাণ করে ভারত এখন প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে অনেক বেশি শক্তিশালী। এর পিছনে অন্যতম কারণ প্রতিরক্ষা বিভাগের নীতির আমূল পরিবর্তন এবং আত্মনির্ভর ভারত গড়তে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বদেশিয়ানা। ২০১৪ সালের পর ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে গেছে যেখানে নিত্য নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে নতুন উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে সেনাবাহিনীর অগ্রগতিতে দেশ এগিয়ে চলেছে।

আত্মনির্ভর ভারত গড়তে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বদেশি উৎপাদন কেন্দ্রীয় সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এই ক্ষেত্রে একসময় ভারত বিশ্বের এক নম্বর অস্ত্র আমদানিকারক দেশ হিসেবে চিহ্নিত ছিল। কিন্তু আজ ভারত প্রায় ২৩৬০০ কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানি করছে। এটি একটি শুভ সূচনা বলা যায়। ট্যাঙ্ক ও ফাইটার জেট ছাড়াও প্রতিরক্ষা গবেষণাগার, স্টার্ট আপ ও অসামরিক শিল্পের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনে দেশ অগ্রসর হয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে মিসাইল ম্যান ড. এপিজে আবদুল কালামের স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে। বর্তমানে রাশিয়া, আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইজরায়েল-সহ বিশ্বের অনেক দেশ ভারত থেকে সামরিক সরঞ্জাম আমদানি করছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আমদানিকারক দেশের তকমা ছেড়ে ভারত এখন রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

বহু দশক ব্যাপী ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদন সরকারি সংস্থা হিন্দুস্তান অ্যারোনোটিক্স লিমিটেড এবং ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সরকারি আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতের বাঁধনে এই ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে গতি ছিল না। যার ফলে গতানুগতিক প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনেও মন্থর গতি ছিল। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে এখানে আমূল পরিবর্তন ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে গতি এসেছে। ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে প্রতিরক্ষা উৎপাদন ১ লক্ষ

২৭ হাজার কোটিতে পৌঁছে গেছে যা ২০১৪-১৫ সালের ইসরো চেয়ে ১৭৪ শতাংশ বেশি। মেক ইন ইন্ডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এবং ডিআরডিও মিলিতভাবে ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণে অনেক এগিয়ে গেছে। অপারেশন সিঁদুর অভিযান সারা ভারতের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে এবং মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পের সফলতা অনুভব করেছে। আজ প্রমাণিত হয়েছে যে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' দেশের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা সময় ছিল, যখন ভারত তার প্রতিরক্ষা ও সামরিক সরঞ্জামের প্রয়োজনে অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে সেই অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়েছে। ভারতের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে আত্মনির্ভর হওয়া খুব আবশ্যক। কারণ ঘাড়ের কাছে পাকিস্তান ও চীন নিঃশ্বাস ফেলছে। এছাড়াও দেশের অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি এবং আত্মসম্মানের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। বেসরকারি ক্ষেত্রের প্রযুক্তি, উৎসাহ ও পেশাদারি অভিজ্ঞতা এই ক্ষেত্রে গতি বাড়িয়েছে। প্রাইভেট স্যাটেলাইটের মাধ্যমে নজরদারির ক্ষেত্রে দেশের অগ্রগতি বেড়েছে। ২০২০ সালে The Defence Innovation Organisation (DIO) প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এর ফলে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণা, প্রযুক্তির ব্যবহারে গতি এসেছে। ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের ফলে উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত উল্লেখযোগ্য ভাবে ক্ষেপণাস্ত্র তৈরিতে এগিয়ে গেছে। শুরুতে মাত্র ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ক্রমবর্ধমান উন্নতির মাধ্যমে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণ অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। সম্প্রতি ভারতের তৈরি ক্ষেপণাস্ত্রগুলি বিশ্বের বাজারে সমাদৃত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে অপারেশন সিঁদুর সফল অভিযানে ক্ষেপণাস্ত্রগুলির কার্যকারিতা বিশ্বের সামনে প্রমাণিত হয়েছে। এমনকী চীন থেকে কেনা পাকিস্তানের বিমানগুলি ভারতীয় মিসাইল দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ধরাশায়ী হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আকাশ মিসাইল যে কোনো জায়গা থেকে বহু সংখ্যক লক্ষ্য ভেদ এবং ট্র্যাক করতে পারে। এটি ৭০ কিলোমিটার আগে থেকেই মিসাইলের খোঁজ পায় এবং ৩০ কিলোমিটার এরিয়ার মধ্যেই ধ্বংস করতে পারে। সাম্প্রতিক অভিযানে ভারতের সামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রে 'আকাশ ও S-400 মিসাইল' উভয়েই কার্যকর ভূমিকা নিয়ে নির্ভেদ্য দেওয়ালের মতো দাঁড়িয়েছে। এখন ভারতের 'আকাশ' ক্ষেপণাস্ত্রের সাফল্য সন্দেহের উর্ধ্বে প্রমাণিত হয়েছে। ভারত এখন বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে ব্যাপক অর্ডার পাওয়ার আশা করতে পারে। এমনকী ২০০ ক্ষেপণাস্ত্রের অর্ডার পেলে ভারত ৩০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব অর্জন করতে পারে। পাকিস্তান-ভারত দ্বন্দ্বে ব্রহ্মোস সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইলের ভূমিকা রণনীতির একেবারে কেন্দ্রস্থলে ছিল যা ১০ মে, ২০২৫ সালে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। পাকিস্তান দ্বারা ভারতের আকাশ সীমা লঙ্ঘনের প্রতিশোধে ভারতীয় বিমান বাহিনী পাকিস্তানের ভিতরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আঘাত করতে সক্ষম হয়েছে। ২০০১ সালের ১২ জুন ব্রহ্মোসের সফল উৎক্ষেপণের পর সাম্প্রতিককালের অপারেশন সিঁদুর অভিযানের কার্যকারিতা প্রথম প্রমাণিত হলো। ভারত ও রাশিয়া যৌথভাবে তৈরি করেছে দ্বি-পর্যায় ব্রহ্মোস মিসাইল। প্রথম পর্বে সুপারসনিক গতি বৃদ্ধি হয় এবং দ্বিতীয় পর্বে শব্দের গতির তিন গুণ গতিতে মিসাইল পৃথক হয়ে লক্ষ্যে আঘাত করে।

যদিও এই ব্রহ্মোস রাশিয়া ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে তৈরি যা বিশ্বের বাজারে চাহিদা তৈরিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। অপারেশন সিঁদুরের পর আন্তর্জাতিক স্তরে নতুন বাজার ও চাহিদা পূরণ করতে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সক্ষম হবে নতুন এই ক্ষেপণাস্ত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতের এই সাফল্যে চীন ও তুরস্ক সম্ভবত সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন। কারণ ভারতীয় সেনাবাহিনী নিজের তৈরি অস্ত্রে সফলভাবে লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস সক্ষম হয়েছে এবং ভারতের ক্ষতির লক্ষ্যে পাকিস্তানের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেছে। ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্রগুলি সমস্ত লক্ষ্যস্থলে নির্ভুল ও নিখুঁতভাবে আঘাত করেছে এবং এর ফলে ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্র ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের বিশ্বাসযোগ্যতা আন্তর্জাতিক বাজারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইতিমধ্যে লক্ষ্য করা গেছে যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রপ্তানি কেবলমাত্র কয়েকটি দেশের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নেই। আমেরিকা, রাশিয়া ও ফ্রান্স এবিষয়ে আগে থেকেই এগিয়ে রয়েছে। কিন্তু ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, তুর্কি ও ইজরায়েল এক্ষেত্রে বর্তমানে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

কয়েকটি তথ্য থেকে ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বদেশি উৎপাদনের ক্ষমতা এবং রপ্তানি সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে।

২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষে ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদন ১২৭০০০ কোটিতে পৌঁছেছে যা ২০১৪-১৫ সালের চেয়ে ১৭৪ শতাংশ বেশি। এটি সম্ভব হয়েছে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের ফলে। ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষে গত এক দশকে ভারত প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে রপ্তানির পরিমাণ ৩০ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২১০৮৩ কোটি টাকা হয়েছে। ২০২৯ সালের মধ্যে ভারত সরকার প্রতিরক্ষা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে ৩ লক্ষ কোটি টাকা এবং রপ্তানির পরিমাণ ধার্য করেছে ৫০০০০ কোটি টাকা। প্রতিরক্ষা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উত্তরপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে দুটি Defence Industrial Corridor (DIC) স্থাপন করা হয়েছে। এর জন্য ইতিমধ্যে ৮৬৫৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ২৫৩টি মউ স্বাক্ষর হয়েছে যার দ্বারা ৫৩৪৩৯ কোটি টাকা সম্ভাব্য বিনিয়োগ হবে বলে আশা করা যায়।

বর্তমানে ৬৫ শতাংশ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম দেশের মধ্যে উৎপাদন হয়ে থাকে। এর আগে প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের ক্ষেত্রে ৬৫-৭০ শতাংশ আমদানির উপর ভারতকে নির্ভর করতে হতো। বেসরকারি ক্ষেত্রও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং মোট প্রতিরক্ষা উৎপাদনের ২১ শতাংশ তারা পূর্ণ করছে। তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় দেশের প্রতিরক্ষা রপ্তানি গত এক দশক ২১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৪-২০১৪ পর্যন্ত এক দশকে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪৩১২ কোটি টাকা। ২০১৪-২০২৪ অবধি এক দশকে তা দাঁড়িয়েছে ৮৮৩১৯ কোটি টাকা যা এক কথায় অভূতপূর্ব। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রতিরক্ষা রপ্তানি ছিল ১৫৯২০ কোটি টাকা যা ৩২.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩-২৪ সালে একবছরে দাঁড়ায় ২১০৮৩ কোটি টাকা। ভারত এখন ১০০টির বেশি দেশে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রপ্তানি করছে।

উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি দেশের কথা উল্লেখ করা যায়। (১) ফিলিপিন্স— ব্রহ্মোস সুপারসনিক এবং ক্রুজ মিসাইল, (২) মরিশাস— আডভ্যানসড লাইট হেলিকপ্টার, এএলএইচ-২২৮ এয়ারক্রাফট, (৩) ফ্রান্স— সফট্‌ওয়ার ও ইলেকট্রনিক, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, (৪) আমেরিকা— এয়ারক্রাফটের পার্টস এবং হেলিকপ্টার। ভারতের অর্থনীতির অগ্রগতির সঙ্গে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও ভারত লক্ষণীয় ভাবে এগিয়ে চলেছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বদেশি উৎপাদন নীতি গ্রহণ করার ফলে এবং মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে ভারত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। আশা করা যায় আগামী ২০২৯ সালের মধ্যে দেশ প্রতিরক্ষায় উন্নত দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্বয়ংভর হয়ে উঠবে। □

ইউনুস সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন চালচিত্র তালিবানি দেশ তৈরির চক্রান্ত চূড়ান্ত

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

ড. মহম্মদ ইউনুস ক্ষমতায় আসীন হয়েই ভাবছেন তিনি হয়তো বাংলাদেশের বাদশা হয়ে গিয়েছেন। যেদিকে তাকান সেদিকটাই যেন তার সাম্রাজ্য। চারদিকের সব মানুষ যেন তার প্রজা। তিনি যা বলবেন, যা করবেন এবং করতে চাইবেন সবাই হয় সেটা মেনে নেবেন, নয়তো মেনে নিতে বাধ্য হবেন। কিন্তু বাস্তবে সেগুলি যে দিবাস্বপ্ন তা এখন আস্তে আস্তে খোলসা হচ্ছে। কোথাও তিনি আর ঠাঁই পাচ্ছেন না।

গত ২২ জুন বিএনপি-র একটি প্রতিনিধি দল চীন সফরে গিয়েছে। চীনের আনুকূল্য পেতে তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফকরুল ইসলাম আলমগিরের নেতৃত্বে মির্জা আব্বাস ও গয়েশ্বর রায়-সহ আরও ছয় জন এই প্রতিনিধি দলে রয়েছে। চীনের একটি বিশেষ বিমানে তারা সেদেশে গিয়েছে বলে খবর। লক্ষ্য একটাই— ক্ষমতায় আসার রোডম্যাপ ও ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করা। এর আগে জামাতের একটি দল ঘুরে এসেছে চীনে। কিন্তু কোনো উপায় তারা বের করতে পারেনি। পরে ইউনুস-সহ আরেকটি প্রতিনিধি বহর বৃথাই ঘুরে এসেছে চীন থেকে। সকলের ঝুড়িতেই অশ্বডিম্ব মিলেছে। ক্ষমতা দখলের মোহে সবাই যার যার মতো করে ফন্দি ফিকির করে যাচ্ছে। কারুরই হালে জল লাগছে না। সবাই পাথরে লাঙ্গল চষে বেড়াচ্ছেন। বিএনপি-র নেতারা এই সফরে অবশ্য সম্ভাবনার মুখ দেখছেন। কারণ ইউনুস আমেরিকার কাছে নাক ঘষে কথা দিয়ে এসেছেন বন্দর, করিডোর ও সেন্ট মার্টিন নিয়ে। এই তিন জায়গায় চীনেরও লোভ-লালসার অন্ত নেই। তারাও চাইছে এগুলি তাদের হোক। এখন আসলে পাবে কারা? নাকি উল্টো ফল হবে? চলছে কূটনৈতিক দ্বৈরথ। কূটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত উপায়ে যে যা চাইবে তা দিয়ে দিতে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দল তৎপর হয়ে রয়েছে। তবুও ক্ষমতা তাদের চাই। ক্ষমতা পেলে আরও কিছু চাইলেও সেগুলিও দিয়ে দিতে তারা একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। চীন বাংলাদেশকে ভালো করেই চেনে ও জানে। চীনা অর্থায়নে সেদেশে বহু প্রকল্প বাস্তবায়ন চলছে। মাঝে একটু থমকে গেলেও এখন আবার চলছে পুরোদমে।

বাংলাদেশে ইসলামি শাসন কায়েম করার জন্য জামাতে ইসলাম তাদের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে পাকিস্তানকে ছাড়া আর কাউকেই দেখছে না। পাকিস্তান এখন ঘরে বাইরে অশান্তি পোহাচ্ছে। ভারতের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বৈরিতা এবং একই সঙ্গে ইরানের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা এখন সমস্যার মুখে পড়েছে। আগ বাড়িয়ে ইরানকে সাহায্যের কথা বলে তারপর আমেরিকার চাপে পড়ে পাকিস্তান এখন পাততাড়ি

সব সরকারের আমলে মন্দিরে আক্রমণ হয়েছে, প্রতিমা ভাঙা হয়েছে, কিন্তু মন্দির ও প্রতিমা ভাঙার ঘটনায় সরকার সরাসরি জড়িত হয়ে এবার ইতিহাস সৃষ্টি করল। এ কৃতিত্ব অবশ্যই ড. ইউনুস সরকারের।

গুটিয়েছে। পাকিস্তানের দেওয়া আশ্বাস পেয়ে প্রাথমিকভাবে ইরান খুশি হলেও মার্কিন আক্রমণের চাপে সে খুশি বাতাসে বিলীন হয়ে গিয়েছে। বাস্তবে মার্কিন আধিপত্যের বলয়ের বাইরে বেরিয়ে পাকিস্তানের কিছুই করার নেই। ফলে পাকিস্তান বাংলাদেশ নিয়ে ব্যস্ত থাকুক সেটাই চাইছে আগ্রাসী দেশ আমেরিকা। আর জামাতও পাকিস্তানের হাত ধরেই রয়েছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত এখন বাংলাদেশের আনাচ কানাচ ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশেষ করে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বর্ডার এলাকাগুলিতে তার পদচারণা বেশি। 'সেভেন সিস্টার্স'কে অশান্ত করার পাঁয়তারা করে যাচ্ছে এই পাক রাষ্ট্রদূত। সম্প্রতি সে সিলেট, কুমিল্লা, ফেনী-সহ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল ঘুরে গিয়েছে বলে সংবাদসূত্রে খবর। যশোর আগেই ঘোরা হয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। 'বাংলাদেশ' যে একটা স্বাধীন দেশ, সেই কথা দেশটির নেতারা বেমালুম ভুলেই গিয়েছেন। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতকে খোলা হাত দিয়ে রেখেছে ইউনুস প্রশাসন। এর পরিণতি যে কতটা ভয়াবহ হবে, সেটা আপাতত বুঝতে পারছে না ইউনুস সরকার। সময়ই বলে দেবে এর পরিণতি!

একদিকে গৃহযুদ্ধের আয়োজন, অন্যদিকে তালিবানি শাসন কায়েমের দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে দেশটির উগ্র মোল্লাবাদী ও জেহাদিরা। মহম্মদ ইউনুস কোথাও 'ঠাঁই' পাচ্ছে না। বেহাল দশা। পদত্যাগ করলেই জেল যাত্রা, আর থেকে গেলেই সীমাহীন অপমান এবং নানারকমের হেনস্থার শিকার তাকে হতে হবে, বাস্তবতার প্রেক্ষিত মেনে সেটা অনেকটাই নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে। ইউনুস জানেন না যে, রাজনীতি একটি ভিন্ন ক্ষেত্র যেখানে শুধু আন্তর্জাতিক খ্যাতিটাই যথেষ্ট নয়। দেশের ভেতরের রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতাও যেকোনো সময় জীবন বিপন্ন করে দিতে পারে। অন্তর্বর্তী সরকার হিসেবে তার মূল কাজ ছিল একটি সকলের অংশগ্রহণমূলক, সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করা এবং বিভিন্ন সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করা। তবে এই কাজগুলোতে ধীরগতি ও জটিলতা থাকার কারণে এই কাজগুলিই যেন তার ক্ষমতায় থাকার লোভকে আরও উসকে দিচ্ছে। ইউনুস হয়তো কোনো বৃহত্তর শক্তির 'কামলা' হিসেবে কাজ করছে এবং বিদেশি প্রভাবে আচ্ছন্ন থাকার দরুন তার নিজস্ব কোনো সুদৃঢ় রাজনৈতিক ভিত্তি ও অভিপ্রায় নেই, বরং ইউনুস অন্যের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নে পুতুলের মতো ব্যবহৃত হচ্ছে। আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার নামে কালক্ষেপ করে চলেছে ইউনুস। ইউনুসের দাবি অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন সংস্কার, সংবিধান সংস্কার, বিচার বিভাগ সংস্কার, পুলিশ সংস্কার, জনপ্রশাসন সংস্কার ও দুর্নীতি দমন করার সাহস দেখিয়ে চলেছেন তিনি। আদতে সংস্কারের নামে অদক্ষ লোকজনকে দিয়ে চলছে এইসব কাজ। তরুণদের ক্ষমতায়নের নামে সীমাহীন লুণ্ঠনের রাজপথ খুলে দিয়েছে ইউনুস। ছাত্র নামধারী কিছু নির্বোধ, জেহাদিদের ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে ইতিমধ্যে বাংলাদেশ জুড়ে নৈরাজ্য কায়েম করেছেন ইউনুস। গ্রামীণ ব্যাংক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সরকারের মালিকানা কমানো এবং গ্রামীণ ব্যাংককে কর ছাড় দেওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে 'কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট' বা স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ উঠেছে। ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের উপরে স্থান দিয়ে আখের গোছানোর কাজে লিপ্ত রয়েছেন ইউনুস।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বর্তমানে যে অস্থিরতা এবং বহুমুখী টানাপোড়েন চলছে, তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন নোবেল বিজয়ী ড. মহম্মদ ইউনুস। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে তার দায়িত্ব গ্রহণ বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করার বদলে বাংলাদেশের সার্বিক পতনকে যেন ত্বরান্বিত করে চলেছে। পুরোপুরি তালিবানি রাজ কায়েম করেছেন ইউনুস আর তার শাগরেদরা। বন্ধু দেশ ভারতের সঙ্গে শত্রুতা করে মিরজাফরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে তথাকথিত অর্থনীতিবিদ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেটোয়া ব্যক্তি মহম্মদ ইউনুস।

গত ২৩ জুন প্রথমে তৌহিদি জনতা ঢাকার খিলক্ষেতে দুর্গা মন্দির আক্রমণ করে। তারা সেদিন সময়সীমা বেঁধে দেয় যে, ২৪ জুন দুপুর ১২টার মধ্যে মন্দির ভেঙে মূর্তি নিয়ে চলে যেতে হবে। হিন্দুরা প্রসাসনের শরণাপন্ন হন। পুলিশ আসে, মিলিটারি আসে। কিন্তু তারা দাঁড়িয়ে থেকে বুলডোজার দিয়ে মন্দির ভেঙে দেয়, প্রতিমা গুড়িয়ে দেয়। হিন্দুরা বুলডোজারের পথরোধ করে মাটিতে শুয়ে পড়ে, পুলিশ টেনে-হেঁচড়ে সবাইকে হটিয়ে দিয়ে বীরদর্পে হিন্দুর মন্দির ভেঙে চুরমার করে।

সব সরকারের আমলে মন্দিরে আক্রমণ হয়েছে, প্রতিমা ভাঙা হয়েছে, কিন্তু মন্দির ও প্রতিমা ভাঙার ঘটনায় সরকার সরাসরি জড়িত হয়ে এবার ইতিহাস সৃষ্টি করল। এ কৃতিত্ব ড. ইউনুস সরকারের। একাত্তরেও হিন্দুদের টার্গেট করা হয়েছিল, মন্দির ভেঙে ছিল, তখন রাজাকার- আলবদর ইসলামি শক্তি এই কাজ করেছিল। এবার পাকিস্তানপন্থী নব্য রাজাকার জেহাদি ইউনুস সরকার একাজ করেছে। বুলডোজার দিয়ে মন্দির ও প্রতিমা ভাঙার ঘটনা হিন্দুরা মনে রাখবে, আজ হোক কাল হোক জবাব দিতে হবে বই কী ইউনুস প্রশাসনকে।

ঢাকার বিভিন্ন সংগঠন মন্দিরে সমবেত হয়ে প্রতিবাদ করে। এ মন্দিরের সভাপতি বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা ও সাবেক মন্ত্রী গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের মেয়ে অপর্ণা রায়। গয়েশ্বর চন্দ্র রায় উপদেষ্টা। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন— উচ্ছেদ নোটিশ ছাড়া কীভাবে দুর্গা মন্দির ভাঙা হতে পারে? জমিটি রেল কর্তৃপক্ষের। একই জমিতে বেশ ক'টি মসজিদ আছে, একশোর বেশি দোকান আছে, একটি রাজনৈতিক দলের অফিস আছে। কিন্তু ভাঙা হয়েছে শুধু মন্দির।

ড. ইউনুস সরকার তৌহিদি সব জনতার দাবি মেনে মন্দির ভাঙল, এর আগে মাজার ভেঙেছে, ধানমণ্ডী বত্রিশ নম্বর ভেঙেছে। এই যে ভাঙাভাঙির খেলা শুরু করেছে, এদিন দিন নয়, সামনে আবার দিন আসবে। ইউনুস পালাবেন কোথায়? রেলের সামান্য একটু জমি থেকে উচ্ছেদ করেছে, অথচ সরকার শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তির নামে হিন্দুদের ২৭ লক্ষ একর জমি (২০১১-র হিসাব মতো) দখল করে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করেছেন। সময় আসবে, হিন্দুরা তাঁদের জমি ফেরত চাইবে সেদিন। □

সিঁদুর ও অভিযান

ভারত-সহ কয়েকটি দেশে সধবার প্রতীক চিহ্ন হলো সিঁথির সিঁদুর। যেমন প্রচলিত ধাঁধা রয়েছে— 'দাদা দেয় একবার, বউদি দেয় বারবার'। উত্তর হলো সিঁথিতে সিঁদুর পরা। ভারতীয় হিন্দু পুরুষের নববধূর সিঁথিতে যে সিঁদুর দান প্রথা প্রচলিত হয়েছে তা একবার প্রদত্ত বা সংঘটিত হলে সধবা নববধূ বা বিবাহিতা বধূ স্বামীর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তা ধারণ করে থাকেন স্বামীর মঙ্গল কামনায়। প্রসঙ্গত স্মরণে আসে--- 'আঙিনাতে যে আছ অপেক্ষা করে/তার পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর' (রবীন্দ্র)। এই সিঁদুর আসলে ভারতীয় হিন্দু নারীর কাছে পবিত্র ও মূল্যবান প্রতীক চিহ্ন। সেজন্য কোনো ভারতীয় সধবার কাছে শাঁখা-সিঁদুরের দিব্যি দেওয়া বা খাওয়া আজও মানসিকভাবে অনেক নারীর কাছে বিপজ্জনক। স্মর্তব্য জনপ্রিয় হিন্দি সংলাপ— 'এক চুটকি সিন্দুর কি কিমত তুন ক্যা জানো রমেশবাবু... ঈশ্বরকা আশীর্বাদ হোতা হ্যায় এক চুটকি সিন্দুর,... সুহাগনকা সরকা তাজ হোতা হ্যায় এক চুটকি সিন্দুর...' (ওম শান্তি ওম)। অথবা 'কত না ভাগ্যে আমার এ জীবন ধন্য হলো/সিঁথির এই একটু সিঁদুরে সবকিছু বদলে গেল' (ছায়াছবি : ব্যবধান, কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্পী : আশা ভোঁসলে)। এই সিঁদুর নিয়ে সধবা অথবা কুমারী ভারতীয় হিন্দু নারীরা সিঁদুর খেলা করতে পারে, কিন্তু বিধবাদের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

এই সিঁদুর কখনো কমলা, কখনো লাল, কখনো হলদেটে হয়ে থাকে। লাল রঙের সিঁদুরকে কুমকুম, কমলাকে ভুরি সিঁদুর বলে। প্রচলিত ভাষায় মেটে বা কমলা রঙের সিঁদুরই বেশি প্রচলিত। মেটে সিঁদুরে তেল মাখিয়ে কপালের টিপ ও তিলক (পুরুষের কপালে প্রদত্ত) একদা বানানো হতো। এক্ষেত্রে পুরুষের কপালে সিঁদুরের তিলক আসলে বীরত্বের লক্ষণ, কিন্তু নারীর সিঁদুর আসলে শৃঙ্গার চিহ্নের প্রতীকী রূপ (যে জন্য শিক্ষিত তরুণ প্রজন্ম বিবাহিত মহিলার ক্ষেত্রে 'চুন-সুর্কি/মোরাম পড়া' পদগুচ্ছ ব্যবহার করত। সুরকি বা মোরাম আসলে মেটে লাল রঙের হয়ে থাকে।

তবে লালচে রঙের মেঘের আভা বোঝাতে সিঁদুরে মেঘ অথবা সিঁদুরে আমকে বোঝায়। বাঙ্গালির বোধ্য প্রচলিত প্রবচনটি হলো— ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। সিঁদুর মেঘ অবশ্য বঙ্গের কেন্দ্রীয় উপভাষায় প্রচলিত হলেও আঞ্চলিক রাঢ়ীতে সিঁদুর আম প্রচলিত। একই রঙের কাঁচা ও পোড়ানো মাটির হাঁড়ি বা পাত্র বোঝাতে এই ধাঁধাটিও রাঢ় অঞ্চলে প্রচলিত— 'কাঁচায় তুলতুল, পাকায় সিঁদুর/ যে না বলতে পারে তার বাপ ধেড়ে ইঁদুর'। তবে এই সিঁদুর একুশ শতকের চলতি বছরে ভারত-পাকিস্তানের প্রেক্ষিতে অন্য মাত্রা নিয়েছে। জঙ্গি হামলায় ২৬ জন হিন্দু স্বামীর মৃত্যুর জন্য যে জীবিত নারীদের সিঁথির সিঁদুর নিশ্চিহ্ন হয়েছে, তারই প্রতিশোধ কল্পে 'অপারেশন সিন্দুর' ভারত সরকারের পক্ষ থেকে গৃহীত হয়েছে, যা এখন পাকিস্তান বনাম ভারতের মধ্যে দ্বিমুখী লড়াইয়ে সচল, যা আমরা গণমাধ্যমের সৌজন্যে এখনো যে পুরোপুরি থামেনি তা দেখতে পাচ্ছি। আবার এই নাম ব্যবহার করে কোনো কোনো কোম্পানি তাদের ব্যবসায়িক জনপ্রিয়তা পাওয়া ও মুনাফা তোলার চেষ্টা করতে শুরু করেছে। যদিও এ নিয়ে জনস্বার্থ মামলা হয়েছে। বিষয়টি বিচারাধীন। তবে সম্ভাব্য ব্যাপার হলো, কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এই নাম গ্রহণ করলে অপারেশন সিন্দুর-এর মর্যাদা হানি হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল।

—**শ্যামলচন্দ্র দাস,**
রামপুরহাট, বীরভূম।

বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলসেতু এখন ভারতে

কাশ্মীরের গা-ছমছমে উপত্যকা পেরিয়ে চেনাব নদীর উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ইতিহাস। বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলসেতু এখন ভারতের মুকুটে এক গর্বের পালক। নাম— চেনাব ব্রিজ। আর এই প্রকল্পের নেপথ্যে কেন্দ্রের অদম্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও রেল মন্ত্রকের প্রযুক্তিগত দাপট। সেতুটির উচ্চতা ৩৫৯ মিটার, ফ্রান্সের আইফেল টাওয়ারকেও ছাড়িয়ে গেছে। এক হাজার তিনশো মিটার দীর্ঘ এই ইস্পাত-কংক্রিটের সেতু আজ শুধু কাশ্মীরকে নয়, গোটা ভারতকেই এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিল। ভারতীয় রেলের দাবি, এ হলো প্রযুক্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কেন্দ্র সরকার বলছে, এটি কেবলমাত্র পরিকাঠামো নির্মাণ নয়, বরং 'নতুন ভারত'-এর প্রতীক।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একে বলেছেন, 'কাশ্মীরের সঙ্গে দেশের সংযোগের সেতুবন্ধন।' দেশের নানা প্রান্ত থেকে অভিনন্দন বার্তা উড়ে এসেছে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে। চেনাব ব্রিজের নির্মাণ শুরু হয়েছিল ২০০৪ সালে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক বাধা পেরিয়ে অবশেষে সেই স্বপ্ন সফল হলো ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে। এই সেতুর মাধ্যমে উধমপুর- শ্রীনগর-বারামুলা রেল সংযোগ সম্পূর্ণ হওয়ার পথ প্রশস্ত হলো। তবে শুধু প্রযুক্তিই নয়, এই সেতু বহন করছে কূটনৈতিক বার্তাও। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান যতই বিরোধিতার চেষ্টা করুক, ভারত তার ভূখণ্ডে উন্নয়নের কাজ থামাবে না, সেই বার্তা স্পষ্ট করে দিল দিল্লি। কাশ্মীরের স্থানীয় বাসিন্দারাও জানাচ্ছেন স্বস্তির কথা। বাঁধভাঙা খুশির উচ্ছ্বাস স্থানীয় সাধারণ মানুষের মধ্যে। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, 'এই সেতু প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর বাস্তব রূপায়ণ।'

ভারতের ইতিহাসে রেল যেমন বার বার অগ্রগতির চালক হয়েছে, চেনাব ব্রিজ সেই ঐতিহ্যকে এক নতুন মোড় দিল। পাহাড়, নদী আর দুর্ভেদ্য ভূপ্রকৃতি— কিছুই থামাতে পারেনি এই দেশের অদম্য গতিকে। ভারতবর্ষ দুর্বার গতিতে এগোচ্ছে বিশ্বগুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে। নাগরিক হিসেবে চলুন আমরাও সম্মানের সেই দৌড়ে শামিল হই।

—**দেবজ্যোতি পণ্ডিত,** কাঞ্চনতার, মালদা।

মুসলমান ভোটের দিকে তাকিয়ে ইরানকে সমর্থন কংগ্রেস ও বামেদের

অজয় ভট্টাচার্য

গত ১৭ জুন অপরাহ্নে ধর্মতলার লেনিন মূর্তির পাদদেশ থেকে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগে, অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের দাবিকে সামনে রেখে, লাল নিশান শোভিত একটি মিছিল শুরু হয়েছিল, যার গন্তব্য ছিল আমেরিকান তথ্যকেন্দ্রের দিকে। যদিও পুলিশের হস্তক্ষেপে মিছিলটি শেষ হয়ে যায় পার্ক স্ট্রিটের কাছে। সেখানেই বিক্ষোভ- সভায় বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন বাম নেতৃবর্গ। অভিযোগ, আমেরিকার সহযোগিতায় ইজরায়েল হামলা চালিয়েছে পশ্চিম এশিয়ার একাধিক দেশে। তাই তাদের সম্মিলিত দাবি 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই'।

ঘটনার সারবত্তা এই যে, বিপ্লবের নাম করে যাঁরা বহু যুদ্ধ লড়ে এসেছেন, রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছেন, তারাই সুবিধা বুঝে শান্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। শান্তি তো সকলেই চায়, কিন্তু দাবিটা তো নির্ভেজাল হতে হবে। 'লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই— স্লোগানে যাঁরা আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলেন তাঁদেরই আর একটি মুখ 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই'। এটা কি আত্মপ্রবঞ্চনা নয়? কমরেডদের এই দ্বিচারিতা দেখে ধর্মতলায় ট্রাম গুমটির পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা লেনিনের মূর্তিও যেন ভাষা খুঁজে পেয়েছিল। লাল নিশান শোভিত একটি মিছিলকে উদ্দেশ্য করে লেনিন বুঝি চেঁচিয়ে বলেছিলেন, 'শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে— একটু পা চালিয়ে ভাই, একটু পা চালিয়ে।' 'একটু পা চালিয়ে, ভাই' কবিতার মধ্য দিয়ে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এমনটাই কল্পনা করেছিলেন।

কমরেডদের শতাব্দী শেষ হয়ে আসার জন্য কমরেডরাই দায়ী। যে কোনো গভীর বিষয়বস্তু সম্যক উপলব্ধিতে বামেদের দেরি হয় চিরকালই। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এক সময়ের মুখপত্রের নাম ছিল 'পিপলস ওয়ার'। ওই মুখপত্রে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর কুকুরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল, যা আমরা সকলেই অবহিত। কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বুর্জোয়া কবি বলে অভিহিত করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে কম্পিউটার ঢুকতে বাধা দিয়েছিল এই বামেরাই।

ইজরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগে এবং প্যালেস্টাইন ও ইরানকে সমর্থন করে বামেদের মিছিলের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো এ দেশের মুসলমান ভোট। কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রকাশ্য রাজপথে গোমাংস ভক্ষণ করেও এঁরা মুসলমান ভোট নিজেদের ঝুলিতে ফিরিয়ে আনতে পারেননি। সোনিয়া গান্ধীও খোলাখুলি ইরানকে সমর্থন করেছেন। উলটে কেন্দ্রীয় সরকারের নিরপেক্ষ অবস্থানকে সমালোচনা করেছেন সোনিয়া গান্ধী। আসলে এদের বরাবরই পাখির চোখ মুসলমান ভোট। এঁরাই বলেন সন্ত্রাসবাদী হামলার বিরুদ্ধে ভারতের আত্মরক্ষার অধিকার আছে। তাই যদি হয়, তাহলে সেই আত্মরক্ষা করতে গেলে তো সন্ত্রাসবাদীরা যে ভাষা বোঝে সেই ভাষায় জবাব দিতে হয়। পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ড এবং তৎপরবর্তী সিঁদুর অভিযানের পর কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের এক প্রখ্যাত বামপন্থী আইনজীবী তো বলেই ফেললেন, 'পাকিস্তান যদি কোনো সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটি থাকে তবে তা ওই দেশের সঙ্গে আলোচনা করে মিটিয়ে নেওয়া উচিত'। এত কিছুর পরও 'যদি কোনো' শব্দবন্ধ যোগ করার অর্থ হলো সিঁদুর অভিযানের প্রেক্ষাপটকে অস্বীকার করা। দ্বিজাতিতত্ত্ব মেনে ভারত ভেঙে গড়ে উঠার পর থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তির আলোচনা চাইবার বিনিময়ে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া তো আর কিছুই পাওয়া যায়নি। যার মস্ত বড়ো প্রমাণ লাহোর চুক্তি এবং তৎপরবর্তী কার্গিল যুদ্ধ। অটলবিহারী বাজপেয়ী যে শান্তির প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন তার শিখা নির্বাপিত হয়েছিল কার্গিল যুদ্ধের মাধ্যমে। তাই জঙ্গিরা যে ভাষা বোঝে সেই ভাষার নাম ছিল 'অপারেশন সিঁদুর'। তবে সিঁদুর অভিযান শত্রুদেশের জঙ্গিদের জবাব দিতে পারলেও 'যদি কোনো' শব্দবন্ধ ব্যবহার করা কমরেডদের বোধোদয় ঘটাতে পারেনি। এমনকী পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডও তাঁদের চোখ খুলে দিতে পারেনি। সঙ্গত কারণেই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন সিঁদুর অভিযান এখনো শেষ হয়ে যায়নি। বলা বাহুল্য সিঁদুর অভিযানের পরবর্তী ধাপ হিসেবে যাঁরা জেগে ঘুমিয়ে থাকেন তাঁদের মনটাকে পরিষ্কার করা দরকার। দেশের সংহতির প্রশ্নে ইজরায়েলিরা সব এক। সেখানে কোনো বিভেদ নেই। তাই ইজরায়েলিরা সংখ্যায় এক কোটি হওয়া সত্ত্বেও মধ্যপ্রাচ্যের ১৮টি দেশের মধ্যে একমাত্র ইহুদি দেশ হিসেবে টিকে আছে। চার কোটি জনসংখ্যার দেশ ইউক্রেন ১৫ কোটির দেশ রাশিয়ার সঙ্গে এখনও লড়ে যাচ্ছে। অথচ জাতীয় সংহতির প্রশ্নে মতানৈক্য থাকার কারণে ১৪০ কোটির দেশ ভারত বারবার জঙ্গি আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছে। সঙ্কটাপন্ন হচ্ছে দেশের স্থিতিশীলতা। ভারতের সেকু-মাকুরা কবে এই সত্যটি অনুধাবন করতে পারবে? □

বিজ্ঞাপন ও নারী

রিনি রায়

হাটে-বাজারে, বাড়ি-সেতুতে, ল্যাম্পপোস্টের গায়ে, সংবাদপত্রে, প্রচার গাড়িতে সর্বত্র যার উপস্থিতি চোখে পড়ে, তা আর অন্য কিছু নয়— বিজ্ঞাপনের পোস্টার বা হোর্ডিং। নানান শরীরী বিভঙ্গে হাস্যময়ী, লাস্যময়ী সুদর্শনাদের দেখা মেলে সেখানে। বর্তমানের ভোগসর্বস্ব সমাজ ব্যবস্থায় পণ্যের ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনে কোম্পানিগুলি (তা সে স্থানীয় ক্ষুদ্র, মাঝারি হোক বা বৃহৎ, বহুজাতিক সংস্থা) নারীকে বিজ্ঞাপনে প্রায় অপরিহার্য করে তুলেছে। মহিলাদের ব্যবহার্য পণ্যসকল বাদ দিয়েও মায় ব্যাংকের লোন থেকে পুরুষের শেভিং ক্রিম, পারফিউম পর্যন্ত প্রায় সর্বত্র নারীর উপস্থিতি। বলাই বাহুল্য বর্তমান সময়ে আমরা যখন নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে বক্তৃতা, সেমিনার, আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক চালাচ্ছি— সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিজ্ঞাপনের দৌলতেই বহু নারীর কাছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। আর এই স্বাধীনতাই নারীর হাতে তুলে দিচ্ছে আত্মসম্মান ও ক্ষমতার মানদণ্ড। এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেই নারী খুঁজে পাচ্ছে তার নিজস্ব পরিচিতি। বাবা নয়, স্বামী নয়, পুত্র নয়— একান্ত স্বপরিচয়েই সমাজের বুকে নির্মাণ করছে তার পরিচিতির, প্রতিপত্তির নিজস্ব সৌধ।

তবে সব বিষয়ের মতো এক্ষেত্রেও কিছু সদর্থক ও নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। সদর্থক ক্ষেত্রটির কথা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে বিজ্ঞাপনের জগতে নাকি নারীকে কেবলমাত্র ভোগ্যপণ্যরূপেই আলোচিত হয়েছে। তাই এবার নঞর্থক দিকটির প্রসঙ্গে আসা যাক। রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে বিজ্ঞাপনের জগতে নাকি নারীকে কেবলমাত্র ভোগ্যপণ্যরূপেই উপস্থাপিত করা হয়— যা আদৌ কাম্য নয়। আর সেই কথার সূত্র ধরেই নারীদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত স্বাধীনতায় ঢুকে পড়ে রক্ষণশীলদের অনধিকার 'হস্তক্ষেপ'-এর করাল গ্রাস। নারী কেবলমাত্র শরীরসর্বস্ব সত্তা নয়। শরীর ব্যতিরেকে তার মনেরও অস্তিত্ব আছে। আর্থিক, মানসিক, চিন্তন ও পেশাগত স্বাধীনতার আস্বাদ উপভোগ করার অধিকার আছে এক্ষেত্রে অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে এ স্বাধীনতা যেন স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত না হয়।

নঞর্থক মতের সূত্র ধরে কেবলমাত্র বিজ্ঞাপনের মডেলদের বা কর্পোরেট সংস্থাগুলির দোষ চাপিয়ে বা সমালোচনা করে অব্যাহতি পাওয়া কোনো কাজের কথা নয়। বরং এর মূল কারণ খুঁজে তা বিশ্লেষণ করে সাধ্যমতো প্রয়োগ করার চেষ্টা করতে হবে। উপভোক্তা ও বিজ্ঞাপন উভয়েই উভয়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত। উপভোক্তা যেমন বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তেমনি তাদের পছন্দ-অপছন্দ, বর্তমান 'ট্রেন্ড'-এর কথা মাথায় রেখেই বিজ্ঞাপন তৈরি হয়। এদেশের উপভোক্তা বর্তমানে জাঁকজমকপূর্ণ, উত্তেজক, স্বল্পবসনা গ্ল্যামারাস সুদর্শনার দ্বারা বিজ্ঞাপিত বিজ্ঞাপনে প্রভাবিত হচ্ছে। তাই সেই অনুসারেই বিজ্ঞাপন তৈরি হচ্ছে। সেই কারণে সর্বপ্রথম আমাদের মনস্থিতির পরিবর্তন দরকার। সবদিক বিবেচনা করলে যেটা উঠে আসে বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপিত বস্তুর উপস্থাপনা যেন অকারণ এবং বাহুল্য দোষমুক্ত হয়। পণ্যকে উপভোক্তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম মাধ্যম বিজ্ঞাপন যেন রুচিশীলতা, দৃষ্টিনন্দন ও পরিশীলিত সংস্কৃতির অনুশীলনলব্ধ হয়। পরিশেষে বলা যায়, যাদের (মডেল) মাধ্যমে বিজ্ঞাপন উপস্থাপিত হচ্ছে এবং যাঁরা বিজ্ঞাপন তৈরি করছেন (উৎপাদনকারী) উভয়েরই সামাজিক, সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতা ও সচেতনতা থাকা দরকার। ■

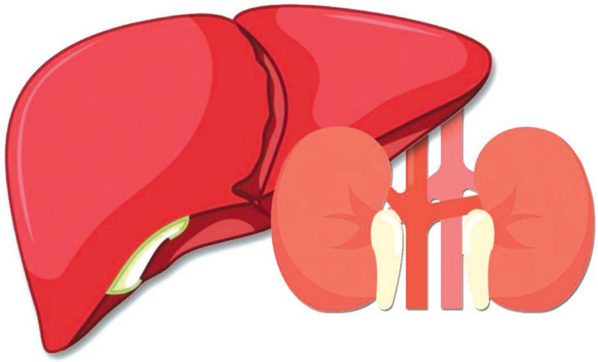

লিভার ও কিডনি ভালো রাখবেন কীভাবে?

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

কিডনি হলো আমাদের শরীরের একটি ফিল্টার। রক্তকে পরিশুদ্ধ করে এবং বর্জ্য পদার্থ বা উপাদানগুলিকে পৃথক করে। তাই এই অঙ্গে সমস্যা দেখা দিলে তা সহজে মেটে না। কিছুক্ষেত্রে প্রাণঘাতীও। তাহলে নিস্তারের উপায় কী? এক্ষেত্রে প্রাচীন একটি প্রবাদ কার্যকরী। সেটি হলো প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর। অর্থাৎ প্রতিরোধ নিরাময়ের থেকে ভালো। কিডনির সমস্যা জাঁকিয়ে বসার আগেই যদি একে চিহ্নিত করা যায়, তাহলে কিন্তু সহজেই নিরাময় মেলে। এক্ষেত্রে স্ক্রিনিং শুরু করতে হবে প্রসূতি মা ও তাঁর গর্ভস্থ সন্তান থেকেই। এবার বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাক।

বাঁচবে প্রজন্ম : আমাদের দেশে লো বার্থ ওয়েট এক বড়ো সমস্যা। এজন্য কিডনির এক ধরনের সমস্যা হয়। নাম 'অলিগো মেগা নেফ্রোনিয়া'। এতে নেফ্রনের সংখ্যা কম থাকে। কিন্তু আকারে বড়ো হয়। এই নিয়ে শিশু বড়ো হলে তার রক্তচাপ ও কিডনির সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ ধরনের সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে ভালো উপায় হলো প্রসূতি মায়ের পুষ্টি ঠিক রাখা। অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর প্রথম, দু'মাস সঠিক পুষ্টিগুণ মেনে খাওয়া-দাওয়া করলে বাচ্চার জন্মের সময় ওজন ভালো হয়। প্রত্যেক হবু মা যদি এই বিষয়টি মাথায় রাখে, তাহলে গোটা সমাজে কিডনি রোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে। এছাড়া, অনেক সময় বাচ্চার জন্মগত কিছু সমস্যা থাকে। এর মধ্যে যেমন রয়েছে, 'প্রোস্টেরিয়র ইউরেথ্রাল ভালভ'। এক্ষেত্রে বাচ্চাদের মূত্রনালীর পিছনে একটি পর্দা তৈরি হয়ে যায়। প্রস্রাব বেরতে সমস্যা হয়। ব্যথা করে। শিশুদের ক্ষেত্রে আরও একটি সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। তা হলো, প্রস্রাব করলে তা বাইরে না বেরিয়ে কিডনির দিকে চলে যায়। ফলে অঙ্গটির ক্ষতি হতে পারে। এরকম আরও বহু সমস্যা রয়েছে যা নবজাতকদের মধ্যে প্রায়শই দেখা যায়। তবে জন্মানোর পরই যদি কিছু রুটিন পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়, তাহলে একটি প্রজন্ম রক্ষা পেতে পারে। এজন্যই প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব অর্থাৎ হাসপাতালে শিশুর জন্ম দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, এখানে জন্মের পরই বেশ কিছু টেস্ট হয়। তাতে সমস্যা ধরা পড়ে। যা শুধু কিডনি নয়, অন্যান্য বহু জটিল, কঠিন রোগ প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকরী।

ব্যথার ওষুধে বিষ : অনেকে ব্যথা কমাতে মুড়িমুড়কির মতো পেইন কিলার ওষুধ খেতে থাকেন। এতে সাময়িকভাবে ব্যথা হয়তো কমে। কিন্তু আরও বড়ো সমস্যা ডেকে আনেন। কারণ, ওই ওষুধগুলো কিডনির সমস্যা তৈরি করে। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে।

শেষ কথা : ফল, শাকসবজি, গোটা শস্য খাওয়ার পরিমাণ বাড়াতে হবে। এগুলি কিডনি-ফ্রেন্ডলি ডায়েটের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এছাড়া সোডিয়াম, প্রক্রিয়াজাত খাবার, অতিরিক্ত চিনি থাকা পানীয়, বাড়তি প্রোটিন বাদ দিতে হবে। অতিরিক্ত রক্তচাপ, ডায়াবেটিস কিডনির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই এগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখা অত্যন্ত জরুরি। সেই সঙ্গে নিয়মিত শরীরচর্চাও গুরুত্বপূর্ণ। আর অতি অবশ্যই প্রচুর জল খেতে হবে। ধূমপান চলবে না। মদ্যপানও চলবে না। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, আপাতত কিডনির সমস্যা নেই মানে আর হবে না, এমনটা ভাবা ঠিক নয়। তাই নিয়মিত পরীক্ষানিরীক্ষার (স্ক্রিনিং) দরকার। অতিরিক্ত পেইন কিলার, অ্যান্টিবায়োটিক প্রচুর ক্ষতি করে দেয়। শরীরের ওজনও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। তাহলেই এই মারণ ব্যাধিকে বশে আনা যাবে।

লিভার আমাদের শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে এর ওজন ১ কেজি ২০০ গ্রাম থেকে দেড় কিলোর মধ্যে থাকে। তবে শুধু ভারে নয়, ধারেও এর জুড়ি মেলা ভার। নীরবেই ৫০০টিরও বেশি কাজ করে লিভার। আমরা দিনরাত যে সব প্রোটিন, শর্করা ও ফ্যাট জাতীয় খাবার খাই, সেগুলির বিপাক হয় এখানেই। সেই সঙ্গে শক্তিও সঞ্চয় করে। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে কোনো সমস্যা ধরা পড়লে শরীরের হাল বেহাল হতে সময় লাগে না। তাই সুস্থ, সবল জীবনের জন্য লিভারের সুস্থতাও জরুরি।

লিভার সুস্থ রাখতে কী খাবেন, কী খাবেন না?

সুষম আহার গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ সঠিকমাত্রায় কার্বোহাইড্রেড, প্রোটিন ও ফ্যাট রয়েছে, এমন খাবারকেই ডায়েটে জায়গা দিতে হবে। ভিটামিন, মিনারেলসও খুব দরকারি। এর সঙ্গে সঠিক সময়ে খাবার খাওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। পাতে থাকবে শাকসবজি, পরিমিত কার্বহাইড্রেট (ভাত-রুটি), প্রোটিন (মাছ, মাংস, ডিম)। এছাড়া টক দইও খুব ভালো। শস্য জাতীয় খাদ্য যেমন ডালিয়া, ওটস, মুসলিও খাওয়া যেতে পারে। অন্য কোনো সমস্যা না থাকলে সুষম আহারে ডিংও কার্যকরী।

পেঁপে, তরমুজ, আপেল, পেয়ারা-সহ মরসুমি ফল খাওয়া যেতে পারে। আর দিনভর পর্যাপ্ত জলও খাওয়া দরকার। আমাদের শরীর জলপ্রধান। ফলে দেহে তরলের মাত্রা ঠিক না থাকলে সব অঙ্গই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। □

হালিসহরে সংস্কৃতভারতীর ক্ষেত্রীয় আবাসিক প্রশিক্ষণ বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হালিসহরে শ্রীশ্রীনিগমানন্দ আশ্রমে গত ৩ থেকে ১৫ জুন সংস্কৃতভারতী পূর্বক্ষেত্রের ১২ দিনের আবাসিক সংস্কৃত প্রশিক্ষণ বর্গের আয়োজন করা হয়। বর্গে শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, চাকুরিজীবী এবং বিভিন্ন পেশার সংস্কৃতপ্রেমী ব্যক্তিরা ছিলেন। প্রতিদিন ভোর ৫টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের কঠোর অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করতে হয়েছে। সংস্কৃতভাষা শুদ্ধ উচ্চারণের জন্য ৬টি গণে বিভাজিত করে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিভিন্ন মহাপুরুষদের জীবনী সংবলিত ছবি দিয়ে প্রদর্শনী কক্ষ সাজানো হয়েছিল। 'সংস্কৃতে বিজ্ঞান' প্রদর্শনী ছিল সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই বর্গে প্রতিদিন বিকেল ৫টা থেকে সন্ধে ৭টা নিঃশুল্ক সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বর্গাধিকারী রূপে ছিলেন সংস্কৃতভারতী উত্তরবঙ্গ প্রান্তের অধ্যক্ষ সিদ্ধিনাথ পাঠক।

বর্গের সমাপণ অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের মুখ্য নির্দেশক ড. আশিস গিরি। সারস্বত অতিথি ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী। প্রধান বক্তারূপে ছিলেন সংস্কৃতভারতী পূর্বক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন হালিসহর নিগমানন্দ আশ্রম মঠের অধ্যক্ষ প্রণবেশ চৈতন্য মহারাজ। ড. গিরি বলেন, সংস্কৃতই হলো ভারতের প্রাণ। এর মাধ্যমেই ভারতের বিকাশ সম্ভব। বর্গাধিকারী শ্রীপাঠক বলেন, প্রশিক্ষণ বর্গে যাঁরা অংশগ্রহণ করলেন তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে গিয়ে সমাজের সকল মানুষকে সহজেই কেবলমাত্র ১০ দিনেই সরল সংস্কৃতভাষায় কথাবলা শেখাতে পারবেন। এই উদ্দেশ্যেই প্রতিবছর সংস্কৃতভারতী এধরনের প্রশিক্ষণ বর্গের আয়োজন করে থাকে।

বঙ্গীয় হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চের উদ্যোগে 'তুলসী সম্মান যাত্রা'

গত ১১ জুন মহেশতলা পুরসভার ৭ নং ওয়ার্ডে জেহাদি সন্ত্রাসের সাক্ষী থাকে গোটা রাজ্য। হিন্দুদের বাড়ি ও দোকানঘর লুঠ করা হয়। মন্দির ও তুলসী মঞ্চ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় জেহাদিরা। পুলিশ ছিল নিষ্ক্রিয় এবং পুরোপুরি দর্শকের ভূমিকায়। তুলসীমঞ্চের অবমাননা এবং হিন্দুদের উপর নৃশংস আক্রমণের প্রতিবাদে গত ১৭ জুন বঙ্গীয় হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চের উদ্যোগে আয়োজিত হয় 'তুলসী সম্মান যাত্রা'। ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেল থেকে এদিন শুরু হয় এই প্রতিবাদী পদযাত্রা। তুলসী সম্মান যাত্রায় অংশগ্রহণ করেন সমাজসেবী সারদাপ্রসাদ পাল, জলধর মাহাতো,রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব রাহুল সিনহা, দেবশ্রী চৌধুরী, অগ্নিমিত্রা পাল, ফাল্গুনী পাত্র-সহ বহু বিশিষ্টজন। মধ্য কলকাতায় মলঙ্গা লেনে বিপ্লবী বীর গোপাল চন্দ্র

মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে এই পদযাত্রা শেষ হয়। উপস্থিত ছিলেন বিপ্লবী গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র শান্তনু মুখোপাধ্যায়।

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে বৃক্ষরোপণ উৎসব

প্রতিনিয়ত গাছ কেটে শহর বাড়ানো হচ্ছে, কমছে বনাঞ্চল, কমছে অরণ্যের পরিমাণ ও অরণ্যবাসী পশুপাখিদের সংখ্যা। শহর থেকে গ্রামে গ্রীষ্মের দাবদাহে সকল প্রাণীর প্রাণ এখন ওষ্ঠাগত হয় গ্লোবাল ওয়ার্মিঙের কারণে। প্রতিবছর বর্ষাকালে যে বৃক্ষরোপণ হচ্ছে তা পর্যাপ্ত নয়। তাছাড়াও যতগুলি গাছ লাগানো হয়, বছর শেষে পর্যাপ্ত পরিচর্যার অভাবে ততগুলি বেঁচে থাকে না। এই সব মাথায় রেখে পৃথিবী তথা ধরিত্রীমাতাকে যত্ন করতে হিন্দুধর্মের শিক্ষা হলো অরণ্য সংরক্ষণ। এই কারণে অরণ্যষষ্ঠীকে উপলক্ষ্য করে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে একটি বনমহোৎসব উদ্‌যাপন করল অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ (বিদ্যালয় শিক্ষা)। গত ১ জুন থেকে ৭ জুন এই কর্মসূচি পালিত হয় রাজ্যের ১৭টি জেলার মোট ১৫৩টি স্থানে। এই কর্মসূচিকে সফল করতে এগিয়ে আসেন সংগঠনের ৩২৮ জন দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ শিক্ষক-শিক্ষিকা। তাঁরা তাঁদের নিরলস প্রয়াসের দ্বারা ৬২৯টি বৃক্ষচারা রোপণ করেন।

এই কর্মসূচি উপলক্ষ্যে সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপী প্রামাণিক বলেন, "আমাদের সংগঠন রাষ্ট্রহিত, সমাজহিত, শিক্ষকহিত ও শিক্ষার্থীহিতে কাজ করে। সেই জন্য বিশ্বব্যাপী পরিবেশ রক্ষার্থে সংগঠনের পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের সংগঠনের লক্ষ্য হলো— শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা নিজেরা পরিবেশ বিষয়ে সচেতন হবেন এবং সকলকে এই কাজে উৎসাহিত করবেন। তাই প্রতিবছর অরণ্য ষষ্ঠীর সময় এক সপ্তাহ ধরে 'একজন শিক্ষক-একটি বৃক্ষ' কর্মসূচি উদ্‌যাপিত হচ্ছে"।

উত্তরবঙ্গ সক্ষমের উদ্যোগে দিব্যাঙ্গ ভাই-বোনেদের সমাগ্রী বিতরণ

গত ১২ জুন সক্ষম, উত্তরবঙ্গ প্রান্তের পক্ষ থেকে দিব্যাঙ্গ ভাই-বোন এবং ষাটোর্ধ্ব বয়স্ক নাগরিকদের বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করা হয়। গত ১ মে জলপাইগুড়ি পাণ্ডপাড়া প্রতাপ সঙ্ঘ ক্লাব ও পাঠাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয় একটি মূল্যায়ন শিবির। সিকিম সিআরসি-র সহযোগিতায় এবং সক্ষম-এর উদ্যোগে এই শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়। তারই সামগ্রী গত ১২ তারিখ বিতরণ করা হয়। এদিন এখানে ৪৫টি হুইল চেয়ার, ২৩টি কানের যন্ত্র, ক্রাচ, কোমরের বেল্ট, কমোড চেয়ার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিব্যাঙ্গ ভাই-বোনদের বিতরণ করা হয়। ক্যাম্পটিতে উপস্থিত ছিলেন সিআরসি, সিকিম-এর আধিকারিকরা।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সক্ষমের সভাপতি তনয়া দাস, কোষাধ্যক্ষ প্রদীপ গুহ-সহ বাপন রায়, টুম্পি দে প্রমুখ।

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক উত্তম কুমার মাহাতোর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা

গত ২৩ জুন পরলোকগমন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক তথা পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক উত্তম কুমার মাহাতো। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় গত ২৪ জুন কলকাতার মানিকতলা-স্থিত কল্যাণ ভবনে অনুষ্ঠিত হয় এক শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ রামদত্তজী চক্রধর, সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত, পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী, সহ-পূর্বক্ষেত্র প্রচারক জলধর মাহাতো, সহ-পূর্বক্ষেত্র প্রচার প্রমুখ ড. জিষ্ণু বসু, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক প্রশান্ত ভট্ট, বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের অখিল ভারতীয় সহ-সংগঠন সম্পাদক ভগবান সহায়, অখিল ভারতীয় কোষাধ্যক্ষ মহেশ মোদী, কল্যাণ আশ্রমের পূর্বক্ষেত্র শিক্ষা প্রমুখ মহাদেব গড়াই, পূর্বক্ষেত্র মহিলা প্রমুখ শকুন্তলা আগরওয়াল, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক সঞ্জয় রস্তোগী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সহ-সম্পাদক সুশীল সোরেন, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সহ-ছাত্রাবাস প্রমুখ মালতী সোরেন, কলকাতা মহানগর সভাপতি রঞ্জিত আগরওয়াল এবং হাওড়া মহানগর সভাপতি মোহনলাল আগরওয়াল প্রমুখ। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে ধীরস্থির ও দক্ষ সংগঠক উত্তমদার স্মৃতিচারণা করেন রামদত্তজী চক্রধর, ভগবান সহায়, মহাদেব গড়াই, সঞ্জয় রস্তোগী, সুশীল সোরেন, শকুন্তলা আগরওয়াল, মালতী সোরেন, স্নেহলতা বৈদ্য, কুসুম দিদি প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে উপস্থিত সকলেই উত্তমদার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে সামাজিক সদ্ভাবনা বৈঠক

'নির্দোষ হিন্দু সমাজ নির্মাণই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত'— গত ২৪ জুন উত্তর কলকাতার বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের সভাগৃহে আয়োজিত সামাজিক সদ্ভাব বৈঠকে এটাই ছিল মূলকথা। এদিনের বৈঠকে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মহাউদ্ধারণ মঠের শ্রীমদ্ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী, রিষড়া প্রেমমন্দির আশ্রমের স্বামী নির্গুণানন্দ মহারাজ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, ইসকনের জগদার্তিহা প্রভু, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল, অখিল ভারতীয় সামাজিক সদ্ভাব প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত। এছাড়াও ছিলেন গৌড়ীয় মিশন, মতুয়া সঙ্ঘ প্রভৃতি বেশ কয়েকটি ধর্মীয় সংগঠনের প্রতিনিধিরা। উপস্থিত প্রতিনিধিরা সকলেই তাঁদের ভাষণে বলেন, ব্যক্তি নির্মাণ হলেই সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রজীবনে সদ্ভাব জাগরণ সম্ভব হবে এবং তার পরিণামে রাষ্ট্রকে পরম বৈভবসম্পন্ন করে বিশ্বগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে। বৈঠক পরিচালনা করেন কলকাতা মহানগরের সামাজিক সদভাবনা প্রমুখ রবিকিঙ্কর ঘোষ।

কেশব ভবনে ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতির উদ্যোগে রক্তদান শিবির

গত ২২ জুন মানিকতলাস্থিত কেশব ভবনে ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতির উদ্যোগে রক্তদান শিবির অয়োজিত হয়। তাতে ৫৪ জন রক্ত দান করেন। শিবিরে উপস্থিত থেকে উৎসাহ দান করেন হেডগেওয়ার স্মারক সমিতির অধ্যক্ষ ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত, অবসরপ্রাপ্ত সেনা আধিকারিক কর্ণেল কুণাল ভট্টাচার্য।

ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে রানি রাসমণি রোডে বিশ্ব যোগদিবস উদ্‌যাপন

প্রতি বছরের মতো এবারও গত ২১ জুন কলকাতা রানি রাসমণি রোডে ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে বিশ্ব যোগদিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন যোগপ্রেমী মানুষ ছাড়াও কলকাতার বিভিন্ন ক্রীড়াকেন্দ্র এবং ২৫টি বিদ্যালয়ের ২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ভারতীর রাজ্য সভাপতি অর্জুন পদকপ্রাপ্ত বিশ্বজিৎ পালিত, রাজ্য সহ সভাপতি প্রখ্যাত শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ ইন্দ্রনীল চৌধুরী,প্রখ্যাত সাঁতারু পদ্মশ্রী বুলা চৌধুরী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাঁতারু তথা বিশিষ্ট পর্বতারোহী মলয় মুখার্জি, ক্রীড়া ভারতীর অখিল ভারতীয় সহ মন্ত্রী মধুময় নাথ এবং ক্রীড়া ভারতীর অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য বিভাস মজুমদার। অনুষ্ঠান শুরু হয় ঋষি পতঞ্জলির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের মধ্যে দিয়ে। মঞ্চ সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সভাপতি তথা বিশিষ্ট পর্বতারোহী দেবাশিস বিশ্বাস। সহযোগিতায় ছিলেন ক্রীড়া ভারতীর দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সম্পাদিকা শ্রীমতী জয়ন্তী মণ্ডল সরকার। সঞ্চালনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বাগত ভাষণও রাখেন।

সমগ্র যোগানুশীলন পরিচালনা করেন ক্রীড়া ভারতীর কলকাতা মহানগর সংগঠন সম্পাদক আশিস পাল এবং কিরণ চৌরাশিয়া। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী-সহ দু'হাজার যোগপ্রেমী মানুষ সঞ্চালদের তত্ত্বাবধানে বেশ কয়েকটি যোগের অনুশীলন করেন।

শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানান ক্রীড়া ভারতীর কলকাতা মহানগর সম্পাদক সঞ্জয় মণ্ডল। উল্লেখ্য, এবছর ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তে বিশ্ব যোগদিবস পালিত হয় ১০৩ স্থানে, তাতে ৬ হাজার যোগপ্রেমী মানুষ সম্মিলিত হন।

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির উদ্যোগে মালদহ শহরে বিশ্ব যোগদিবস উদ্‌যাপন

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির উদ্যোগে গত ২১ জুন মালদা শহরের অরবিন্দ পার্ক সরস্বতী শিশুমন্দির প্রাঙ্গণে বিশ্ব যোগদিবস উদ্‌যাপন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির মালদা জেলা সঞ্চালিকা শ্রীমতী নীতা সাহা। সেবিকারা শুভ্র পোশাকে সজ্জিত হয়ে সূর্যনমস্কার-সহ অঙ্গ সঞ্চালন, শ্বাস-প্রশ্বাস, বৃক্ষাসন, তাড়াসন, অর্ধকোটি চক্রাসন, অর্ধ চক্রাসন,হস্তপদাসন, উষ্ট্রাসন, ধনুরাসন এবং দণ্ডায়মান ও শয়ন অবস্থায় বিভিন্ন আসন ও যোগব্যায়াম সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন। বংশীবাদনের তালে কয়েকটি যোগব্যায়াম তাঁরা সুন্দরভাবে প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ সম্ভাগের বেশ কয়েকজন কার্যকর্ত্রী। মালদা নগরের সমিতির নিবেদিতা, রাসমণি, ও মা সারদা শাখার সেবিকারা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতি তথা যৌগিক গুরুর আসন অলংকৃত করেন ভারতীয় রেলের জোনাল কমিটির সদস্য তথা পূর্বতন জিএস এবং মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের দায়িত্বশীল পদাধিকারী তপন দাস মহাশয়। তিনি যোগচর্চা ও যোগ দিবসের মাহাত্ম্য সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। শ্বাস গ্রহণ, স্থিতি ও নির্গমনকে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিদেবের সঙ্গে তুলনা করেন। শ্রীমতী নীতা সাহা তাঁর মূল্যবান ভাষণে ভারতীয় যোগ সাধনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। সুভাষিতম, সমবেত সংগীত, একক গীত পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সমিতির মালদা জেলা কার্যবাহিকা রুম্পা দাস এবং জেলা শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখ গোলাপী সোরেন। শান্তিমন্ত্র উচ্চরণ করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের ফেসবুক গ্রুপ 'কাঞ্জিক-কাহন'-এর প্রকাশ্য সভা

জাতীয়তাবাদী সংগঠন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের মুখপত্র 'কাঞ্জিক'। এই সংগঠনের ফেসবুক গ্রুপের নাম 'কাঞ্জিক-কাহন'। গত ১৪ জুন, মধ্য কলকাতায় কলেজ স্কোয়ারের পাশে ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় কাঞ্জিক-কাহনের প্রকাশ্য সভা। সভায় উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের চেয়ারম্যান এবং ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা সুভাষ চক্রবর্তী, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সাধারণ সম্পাদক ও কাঞ্জিকের সম্পাদক অনিমিত্র চক্রবর্তী এবং ১৯৪৬ সালে জেহাদিদের ডাইরেক্ট অ্যাকশনের বিরুদ্ধে আগ্নেয় প্রতিরোধ গড়ে তোলা বিপ্লবী গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র শান্তনু মুখোপাধ্যায়। কাঞ্জিক-কাহনের সদস্যরা এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন সুভাষ চক্রবর্তী, অনিমিত্র চক্রবর্তী, শান্তনু মুখোপাধ্যায়, সুব্রত দত্ত প্রমুখ। মোথাবাড়ি, মুর্শিদাবাদ,

মহেশতলা— পশ্চিমবঙ্গের কোণে কোণে সংঘটিত সাম্প্রতিক জেহাদি সন্ত্রাস ও উপদ্রবের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সমগ্র হিন্দুসমাজকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দেন তাঁরা।

বাঙ্গালি হিন্দুরা বহু বছর ধরে পরাধীনতার শিকার এবং তার ফলশ্রুতিতে সংঘটিত দেশ বিভাজন যেন ছিল বাঙ্গালি হিন্দুর কফিনে শেষ পেরেক। ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত লড়াই এবং বিপ্লবী বীর গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দুর্ধর্ষ সংগ্রামের পরিণামে বাঙ্গালি হিন্দু 'পশ্চিমবঙ্গ'- নামক হোমল্যান্ডটি অর্জন করলেও গত ৭৫ বছর ধরে এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলাগুলির জনবিন্যাসের পরিবর্তন এবং হিন্দুসমাজ ধর্মনিরপেক্ষতার আফিমে আচ্ছন্ন থাকার কারণে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বেড়ে চলেছে জেহাদি দৌরাত্ম্য। ঘনিয়ে উঠছে হিন্দুসমাজের অস্তিত্বের সংকট। এর মোকাবিলায় হিন্দুসমাজের সার্বিক প্রতিরোধের বিষয়টির উপর বক্তারা বিশেষভাবে জোর দেন।

ফঃ ৪

‘দিশা’র উদ্যোগে ড. শ্যামাপ্রসাদ বলিদান দিবস উদ্‌যাপন

গত ২৩ জুন প্রখ্যাত সমাজসেবী সংগঠন দিশার উদ্যোগে সল্টলেক নগরীর ঐক্যতান সাংস্কৃতিক পরিসরে উদ্‌যাপিত হলো ড. শ্যামাপ্রসাদ বলিদান দিবস। উপস্থিত ছিলেন পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা ড. আশি, গিরি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত, সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের বিজ্ঞানী ড. জিষ্ণু বসু, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. অশোক লাহিড়ী, সুরেন্দ্রনাথ কলেজেকর অধ্যাপিকা ড. পাপিয়া মিত্র। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ড. পূজন কুমার সেন। বক্তারা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রচেতনা-সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং অরুণ কুমার চন্দ্রকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বিশিষ্ট শিল্পী অরুণ কুমার চক্রবর্তী যিনি কেবলমাত্র সুতো সাহায্যে শ্যামাপ্রসাদের প্রতিকৃতি চিত্রাঙ্কন করে সকলকে মুগ্ধ করেন, তাঁকেও সংবর্ধনা জানানো হয়। শেষে সকলের হাতে একটি করে তুলসীচারা তুলে দেওয়া হয়।

সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে দুই হাজার শিল্পীর কণ্ঠে বন্দে মাতরম্

ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বলিদান দিবস স্মরণে এবং বঙ্গীয় সংস্কৃতির পুনর্জাগরণে ‘বন্দেমাতরম’-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ২৩ জুন কলকাতা-স্থিত সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় ‘দুই হাজার শিল্পীর কণ্ঠে বন্দেমাতরম’। এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল— সনাতনী এডুকেশন অ্যান্ড কালচারাল ফাউন্ডেশন ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ফাউন্ডেশন।

বৈদিক মন্ত্র সহকারে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। ১৫০টি শঙ্খবাদনের পর হয় অতিথি বরণপর্ব। এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী অশ্বিনী কুমার উপাধ্যায়, স্বামী পরমাত্মানন্দজী মহারাজ, আচার্য সঞ্জয় শাস্ত্রী মহারাজ, হিরণ্ময় গোস্বামী মহারাজ, মানস ভট্টাচার্য্য, বসন্ত শেঠিয়া,

বিশ্বজিৎ পাল, পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ড. নারায়ণ চক্রবর্তী, বিপ্লবী গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র শান্তনু মুখোপাধ্যায়, সাংসদ জগন্নাথ সরকার, বিধায়ক ড. শঙ্কর ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্টজন। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন সুশান্ত মজুমদার, মনোজ মণ্ডল, বরুণ বারিকদার, কল্লোল দাস, সমীর ঘোষ ও দীপ দাস। স্বাগত ভাষণদান করেন সাংসদ জগন্নাথ সরকার। এরপর মঞ্চ ও অডিটোরিয়ামে উপস্থিত প্রায় ২০০০ মানুষের সমবেত কণ্ঠে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বন্দেমাতরম' গানটি গাওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন অশ্বিনী কুমার উপাধ্যায়। তাঁর উদ্দীপ্ত ভাষণের পর বক্তব্য রাখেন এদিনের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি স্বামী পরমাত্মানন্দজী মহারাজ। তাঁদের বক্তব্যের পর হয় দেশাত্মবোধক নৃত্য ও সংগীতের অনুষ্ঠান। নৃত্য পরিবেশনায় ছিল শান্তিনিকেতনের কণীনিকা নৃত্য মন্দির ও কলকাতার বহ্নিশিখা ডান্স গ্রুপ। সংগীত পরিচালনায় ছিলেন জি বাংলা সারেগামাপ া-র গ্রুমার কল্যাণ ভট্টাচার্য। বিশিষ্ট অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষের নির্দেশনায় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী আধারিত একটি পাঠকও এদিন মঞ্চস্থ হয়। এরপর সমাপ্তি ভাষণদান করেন সনাতনী এডুকেশন অ্যান্ড কালচারাল ফাউন্ডেশনের সভাপতি বসন্ত শেঠিয়া।

সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীতের মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে সক্ষম দক্ষিণবঙ্গের স্থাপনা দিবস উদ্‌যাপন

গত ২২ জুন কলকাতার বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের সভাকক্ষে দক্ষিণবঙ্গ সক্ষমের ১৭তম স্থাপনা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন সক্ষমের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সভাপতি ডাঃ অরবিন্দ ব্রহ্ম। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত এবং পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বস্তিকা পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য, প্রচার-প্রসার প্রমুখ জয়রাম

মণ্ডল-সহ সমাজের বহু সমাজসেবী এবং দিব্যাঙ্গ পরিবার জন। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত ৬জন দিব্যাঙ্গ ভাই-বোনের মায়েদের বিশেষভাবে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় এবং ১২জন দিব্যাঙ্গ ভাই-বোনের হাতে বিশেষ উপহার তুলে দেওয়া হয়। এদের মায়েরা নিজ নিজ অনুভব ব্যক্ত করেন এবং আগামীদিনে সক্ষমের সহযোগী হবেন বলে মত প্রকাশ করেন। দিব্যাঙ্গ ভাই-বোনেরা নাচ, গান, আবৃত্তি এবং যন্ত্রসংগীত সহযোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। সব মিলিয়ে অনুষ্ঠানে ৯৫জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সক্রিয় সহয়োগিতায় ছিলেন সক্ষমের পূর্বতন সভাপতি ডাঃ সনৎ কুমার রায়, বর্তমান সহ সভাপতি ডাঃ তরুণ কুমার সরকার, অরিন্দম উপাধ্যায়-সহ সংস্থার সদস্যরা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ডাঃ সাত্যকি দাস, সুনন্দা ব্যানার্জি, অরিন্দম মুখোপাধ্যায় এবং সম্পাদক অনিক ব্যানার্জি।

With Best Compliments
From -

Kotilya Consultants Limited

16-B, Shakespeare Sarani
B. K. Market, 1st Floor, Kolkata - 700 071

মালদহের ঐতিহ্যমণ্ডিত রামকেলি মেলা

দীপশুভ্র পণ্ডিত

'গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরে এক গ্রাম। ব্রাহ্মণ সমাজ তার রামকেলি নাম।।' বৃন্দাবন দাস রচিত চৈতন্যভাগবত (অন্ত্যখণ্ড) গ্রন্থে রামকেলির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইতিহাসের গন্ধমাখা এই গ্রাম ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু মানুষের গন্তব্য হতেই পারে। তবে রামকেলি মহোৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঐতিহ্য আর মাহাত্ম্য। সঙ্গে প্রচুর জনশ্রুতি আর লোকগাথা। তাই এই মেলার আকর্ষণ অনিবার।

পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার ইংরেজবাজার থানার একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম এই রামকলি। ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ পাওয়া না গেলেও কথিত যে শ্রীরামচন্দ্র তাঁর শ্বশুরবাড়ি মিথিলা যাওয়ার সময় পুণ্ড্রদেশ (তখনকার নাম), বর্তমানে মালদহে কিছুদিন যাপন করেছিলেন। সেখানে কালিন্দী নদীর তীরে আমবাগানে শ্রীরামচন্দ্র আমের স্বাদে-গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে ফলকেলি শুরু করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র আম নিয়ে কেলি করায় এই স্থানের নাম হয়ে যায় রামকেলি। ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ১৫১৫) শ্রীচৈতন্যদেবের রামকেলি গ্রামে আগমন হয়। হরিনাম প্রচারে শ্রীচৈতন্যদেব বেরিয়ে আসেন ওড়িশায়। সেখান থেকে মথুরা-বৃন্দাবন যাওয়ার পথে গৌড়ে আসেন তিনি। তখন রামকেলি গ্রামে দিন তিনেক ছিলেন। সময়টা ছিল জুন মাসের মাঝামাঝি জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি। তখন হোসেন শাহ্ তৎকালীন গৌড়ের সুলতান। তার দু'জন রাজকর্মচারী সনাতন ও রূপকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন মহাপ্রভু। সনাতন গোস্বামীর পূর্বনাম ছিল অমর এবং রূপ গোস্বামীর নাম ছিল সন্তোষ।

ভারতে সবাই পিতৃপিণ্ড দেওয়ার কথা জানে। কিন্তু একমাত্র রামকেলিতে মেলার প্রথম দিনে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড থেকে প্রচুর মহিলা ভক্ত আসেন এবং এটাই সম্ভবত একমাত্র ভারতের অন্যতম স্থান যেখানে মাতৃ পিণ্ডদান করা হয়। মহিলারাই পিণ্ডদান করেন। এই পিণ্ডদান কেবল রামকেলি মেলার সময় হয়ে থাকে। সকাল ৫টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত এই পিণ্ডদান চলে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমন উপলক্ষ্যে প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তিতে রামকেলিতে বিরাট মেলা বসে। ৫০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই মেলা চলে আসছে। এই মেলা চলে সাতদিন ধরে। বৈষ্ণব সমাজে রামকেলি মেলা গুপ্ত বৃন্দাবন মেলা নামে পরিচিত।

রামকেলি মেলা বিখ্যাত আর একটা কারণে। বৈষ্ণব সমাজের বিয়ের জন্য। প্রাচীনকালে রূপ সাগরের উত্তরপাড়ে এক বিস্তৃত চাতালে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের মিলন উৎসব হতো। বৈষ্ণবীরা কাপড় দিয়ে নিজেদের আবৃত করে রাখতেন। ফলে বৈষ্ণবরা তাঁদের চেহারা দেখতে পেতেন না। শুধু বাঁ হাতের কড়ে আঙুল (মতান্তরে অনামিকা) দেখে বৈষ্ণবী নির্বাচন করা হতো। এখন মালাবদল (কণ্ঠী বদল) করে গান্ধর্ব মতে বিয়ের অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। আষাঢ় মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় দিন মন্দির প্রাঙ্গণে কীর্তন, পালাগান, বাউলগানের আসর বসে।

মালদহ শহর থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার হলেও এটা সম্পূর্ণ গ্রামীণ মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি থেকে পরবর্তী সাত দিন ধরে চলে ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই মেলা। প্রতি বছর কয়েক লক্ষ মানুষের সমাবেশ হয় এই মেলায়। এর জেরে গমগম করে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের এই গৌড়ভূমি। কোনো এক সময় এই মেলায় শুধুমাত্র আঙুল দেখে জীবনসঙ্গিনী নির্বাচন করতেন বৈষ্ণবরা। সেই কারণে এই মেলার আরও এক নাম গুপ্ত বৃন্দাবন। মেলায় ছোটো-বড়ো মিলিয়ে প্রায় হাজারের উপরে দোকান বসে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা এই মেলায় অংশগ্রহণ করেন। যেহেতু গ্রীষ্মের মেলা, তাই এই মেলার প্রধান আকর্ষণ আম। জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির আগেই বর্ষা এসে যাওয়ায় বৃষ্টি ও কাদা এই মেলার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কাদা মেখেই মেলায় ভিড় করেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। রামকেলিতে মেলা ছাড়াও কিছু দর্শনীয় স্থান আছে। এর মধ্যে সনাতন গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন জিউ মন্দির উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এই মন্দিরের পূর্ব কদম ও তমালগাছের তলায় পাথরের ওপর মহাপ্রভুর যুগল পদচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত। এই পদচিহ্ন সংরক্ষণের জন্য রয়েছে একটি ছোটো মন্দির। এখানে মন্দির কর্তৃপক্ষকে বললে, তাঁরা সঙ্গে করে নিয়ে দেখান মহাপ্রভুর পদচিহ্ন। এখানে এসে এই সুযোগ কেউ হাতছাড়া করেন না। মদনমোহন জিউ মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রূপ সাগর, উত্তর পূর্বে সনাতন সাগর। স্থানীয়ভাবে এটা সনাতন দীঘি নামে পরিচিত। এছাড়াও রয়েছে শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, শ্রীরাধার অষ্টসখীকুণ্ড।

এই মেলায় ছুঁয়ে দেখা যায় রসকদম্বের রসে অবগাহন করা গৌড়ীয় ইতিহাস। কদমফুলের মতো দেখতে এই মিষ্টি আজও বহন করছে চৈতন্যদেবের কেলিকদম্ব গাছের স্মৃতি। আজ টাঁড়ার খাজা, মনোহরার জায়গা দখল করেছে হালফিল ক্যাডবেরি মিষ্টি, বেকড্ রসোগল্লা, আরও কত কী। কিন্তু এত কিছুর পরেও মালদার রসকদম্ব এখনো টিকে রয়েছে। মালদহে সবচেয়ে পুরোনো মিষ্টি টাঁড়ার খাজা। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে প্রাচীন বঙ্গের রাজধানী গৌড়ের শেষ সুতলান ছিলেন সুলেমান কররানি। কররানির বংশধরেরা রাজধানীকে টাঁড়ায় সরিয়ে নেয়। সেই সময় জয়নগর থেকে এক মৌলবি টাঁড়ায় এসে খাজা তৈরি শুরু করে। সুলতানি আমলের সেই খাজা এখন আর তৈরি হয় না। আঙুরের মতো দেখতে মনাক্কা মিষ্টিও নেই। নেই ছোটো কুলের মতো দেখতে মনোহরাও। কিন্তু এখনো আছে শুধু রসকদম্ব। জনশ্রুতি, শ্রীচৈতন্যদেব নাকি ভালোবাসতেন এই মিষ্টি। ইতিহাস ও পরম্পরার এক আশ্চর্য মিলনস্থল এই রামকেলি। □

শ্রীল প্রভুপাদ ও গৌড়ীয় মিশন

শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ--- ‘পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র সঞ্চার হইবে মোর নাম।।’ ‘জগতে মায়িক নামই সর্বত্র চলছে, বৈকুণ্ঠনাম প্রচারিত হোক। পাঞ্চরাত্রিক পদ্ধতি অনুসারে প্রতিনিধি থাকেন থাকুন, মন্দির করা হোক, ঠাকুর থাকুন কিন্তু letter class-higher class যাঁরা, তাঁদের প্রচারকার্য বৈকুণ্ঠনামের সর্বত্র প্রচারই মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট—এই কথা ইংল্যান্ডে প্রচারক শিষ্যের উদ্দেশে বলেন শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ।’

আজ সারা পৃথিবীতে গৈরিকবসন, শিখাসূত্রধারী যত বৈষ্ণব আছেন সকলের গুরু হলেন এই শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে বেলা ৩টার সময়, পুরীর ডিএম পরবর্তীতে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের কালেক্টর অফিসার শ্রী কেদারনাথ দত্তের পুত্ররূপে মা ভগবতীদেবীর কোল আলো করে জন্ম নিলেন শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীমন্দিরের কাছেই ‘নারায়ণছাতা’ ছিল বাসগৃহ। ছ'মাস পরে রথযাত্রা করে শ্রীজগন্নাথদেব গুণ্ডিচা মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন কিন্তু নিজের এই ছোট্ট ভক্তকে দর্শন করার উদ্দেশ্যে যমসদনে নচিকেতার মতোই তিনদিন অপেক্ষা করলেন দ্বারে। মা কোলে নিয়ে রথে উঠে ছেলেকে জগন্নাথের চরণপ্রান্তে শুইয়ে দিতে ছেলে দু'হাতে জগন্নাথকে ধরে আপনবোধে হাসতে লাগলো। আর জগন্নাথ তাঁর আশীর্বাদরূপে প্রসাদী মালা ছিঁড়ে ফেললেন শিশুর মাথায়। ঠিক তারপরই রথ চলতে লাগলো। এইভাবেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ প্রভুপাদ পথ চলা শুরু করলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকটের পর গোস্বামীবর্গ তাঁর প্রেম শুদ্ধভক্তির মতাদর্শ উত্তর-পূর্ব ভারতে বহুলপ্রভাবে প্রচার করলেও কালের গতিতে তা কিছুজনের মনোধর্মের মিশ্রণে বিকৃত হয়ে ১৩টি অপসম্প্রদায় সৃষ্টি করে। শ্রী কেদারনাথ দত্ত মহাশয় অবলুপ্ত প্রায় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ষড়গোস্বামী শুদ্ধভক্তি ধর্মের কিছু গ্রন্থের খোঁজ পেলেন ওড়িশার রাজপরিবারের গ্রন্থালয়ে। এগুলো পড়ে তিনি বুঝলেন সমাজের নীচু শ্রেণীর কিছু লোক যে নিতাই-গৌর প্রবর্তিত ধর্মের ধ্বজা উড়িয়েছে তা সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত শুদ্ধভক্তির ধারা নয়। তিনি খুঁজে খুঁজে যেখানে যত শুদ্ধভক্তিধারার পালক বৈষ্ণব রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে লাগলেন এবং সমাজে শিক্ষিত জনসভায় এই শুদ্ধভক্তি মতের আলোচনা করে মহাপ্রভুর ভক্তিধারাকে পুনরায় আবাহনের চেষ্টা করে চললেন। গোস্বামী রচিত গ্রন্থ উদ্ধার, পুনর্মুদ্রণ, বাংলা ভাষায় অনুবাদ, কোথাও টীকা-টিপ্পনীর সংযোজন ইত্যাদির করে ছাপানোর জন্য নিজের বাড়িতে ছাপাখানা খুললেন, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় মাসিক পত্রিকা বের করতে লাগলেন। ঠিক এই পরিমণ্ডলে বড়ো হলেন অসামান্য শ্রুতিধর ও স্মৃতিশক্তিশালী শ্রীল প্রভুপাদ। কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ পড়ে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাবার আদেশে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজীর কাছে দীক্ষা নিয়ে গৌড়ীয় ধারায় প্রবেশ করে তীর্থপর্যটন, শতকোটি মহামন্ত্র গ্রহণ ব্রত সমাপনান্তে শুরু করলেন গৌরলীলা স্থান, গৌরপার্ষদের লীলাস্থান পর্যটন এবং সেখানে শুদ্ধভক্তির পুনঃপ্রচার।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুরের বালিঘাইতে আয়োজিত স্মার্তব্রাহ্মণদের সভায় অশেষ শাস্ত্রপারদর্শী, বুদ্ধিদীপ্ত, বাগ্মী, তেজস্বী, বিনম্র তরুণের দর্শন এবং শাস্ত্রযুক্তিতে তুখোড় ভাষণে মুগ্ধ জনসমুদ্র তাঁর পা-ধোওয়া জল চাইতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। বিভিন্ন ধর্মীয় সভা, তর্ক-বিতর্কে তার মতের প্রাধান্য স্থাপিত হতে লাগল। শিক্ষিত সমাজ তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য তাঁর দর্শনপ্রার্থী হতে লাগল। বিভিন্ন রাজা- মহারাজা, রায়বাহাদুররা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা তাঁর কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা যেমন করলেন, তেমনি কেউ কেউ তাঁর শিষ্যত্বও গ্রহণ করে ফেললেন, তা সে ত্রিপুরাধীশই হোন আর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যই হোন। শ্রীল প্রভুপাদ কলকাতার অ্যালবার্ট হলে যেমন শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করে বক্তব্য রাখেন তেমনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্য সকলকে গৌড়ীয় দর্শনের সিদ্ধান্তের অনুরণনে বিস্ময়ে হতবাক করে নিজ পদপ্রান্তে নত করিয়ে ফেলেন অনায়াসে। এরই মধ্যে নিরলস পরিশ্রমে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ‘ভাগবত যন্ত্রালয়’ স্থাপন করে স্বরচিত ‘অনুভাষ্য’-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদের টীকা-সহ গীতা ও গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবতম্ (শ্রীল প্রভুপাদের স্বরচিত বিবৃতি-সহ) প্রভৃতি বহু গ্রন্থ ছাপানোর কাজ শুরু করেন। কটকেও ছাপাখানা স্থাপন করে উৎকল ভাষায় পরমার্থী, এছাড়াও দৈনিক নদীয়া প্রকাশ, পাক্ষিক গৌড়ীয়

পত্রিকা ছাড়াও ৬টি ভাষায় মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন যা বৈকুণ্ঠদূতের মতো জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে উদ্যোগী হয়, তেমনি সমাজে শুদ্ধভক্তির ধর্মীয় চেতনা জাগিয়ে তোলে এবং বিরোধী মিথ্যা তার্কিকদের শাস্ত্রযুক্তি জিভ কাটে। বৈষ্ণব দর্শনের সূক্ষ্মতা বোঝাতে কলির তমো অর্থাৎ তর্ক-কলহ-বিনাশে দক্ষ প্রভুপাদ শুদ্ধভক্তির মন্দাকিনী- বিমলপ্রবাহে-ভবার্ণবে পতিত জীবকুলের তপ্তপ্রাণ শীতল করেন। তাঁর এক গুণগ্রাহী বলেন—

হানি' সুসিদ্ধান্ত উপধর্ম খান খান
সজ্জনের বাড়ালে উল্লাস ॥
স্মার্তমত জলধর শুদ্ধভক্তি রবিকর
আচ্ছাদিল ভাবিয়া অন্তরে।
শাস্ত্রসিন্ধু মন্থনেতে সুসিদ্ধান্ত ঝঞ্ঝাবাতে
উড়াইলা দিগ্‌দিগন্তরে ॥

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যদেবের আচারিত ও প্রচারিত বৈদিক শাস্ত্রসিন্ধুর মন্থনীভূত শুদ্ধভক্তিকে জগতের বুকে চিরজাগরুক রাখতে স্থাপন করলেন মঠ ও মিশন। এই মঠবাসীরা হলেন দৈববর্ণাশ্রম যাজী এবং শ্রীমহাপ্রভুর মুখনিঃসৃত শিক্ষাষ্টকের মূর্ত বিগ্রহ। তাঁদের আচরণ সর্বদা তাঁদের ঢাল হয়ে দাঁড়ালো। তাঁরা শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে প্রচারক হলেন শুদ্ধভক্তির তলোয়ার নিয়ে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর পিয়ন হয়ে জগতবাসীর দ্বারে দ্বারে আজও তারা উপস্থিত। ভগবানের কীর্তন যেমন করতালের সঙ্গে মৃদঙ্গ ধ্বনিতে রসাল হয়ে উঠে, তেমনি গৌড়ীয় মঠের শুদ্ধভক্তিযাজী সেবকরা নিরন্তর অনলসভাবে মহাপ্রভুর বাণী কীর্তনে জীবন্ত-মৃদঙ্গ হয়ে বিশ্ববাসীকে কৃষ্ণকীর্তনের রসিক করে তুলেছেন। তারা প্রত্যেকে নিষ্কাম হয়ে নিরাগবক্তায় পরিণত হয়েছেন, ফলে জীব-মঙ্গলেও সমর্থ হয়েছেন। সরাগবক্তা জনরঞ্জন করতে গিয়ে মঙ্গল সাধনে বিফল হন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, 'বড়ো দরিদ্র জীব আমরা, দরিদ্র নারায়ণ নই। আমাদের এই দরিদ্রতা কমে যাওয়া দরকার। ধন সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কৃষ্ণপ্রেমই সেই মহাধন। 'প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন। দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন।' —এটাই আমাদের প্রার্থনীয় বিষয়। কৃষ্ণপ্রীতি প্রয়োজন হলে কৃষ্ণেতর বস্তুতে অপ্রীতি স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। নয়তো পঞ্চরাত্রের মূল উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হয়ে অন্য বিচার প্রবল করে ফেলি, মস্ত বড়ো কর্মবীর হয়ে পড়তে চাই।'

শ্রীল প্রভুপাদ ইংল্যান্ড, জার্মানি, মায়ানমার প্রভৃতি দেশের প্রেরিত প্রচারকদের উদ্দেশে বলেন, দাম্ভিক লোক কখনো প্রচারকার্য করতে পারে না। দাম্ভিক প্রচারকের সাজ নিয়ে 'আমিই প্রচারক'— এই অভিমান করে, বাস্তব সত্য তার কাছে আত্মপ্রকাশ করে না, সুতরাং তার দ্বারা জগতের কোনো বাস্তব মঙ্গল বিহিত হতে পারে না। কেউ অমেধ্যভোজী হবে, কেউ স্বদেশ প্রীতির নামে স্ব-পর ভেদদর্শী হয়ে মাৎসর্যানলে দগ্ধীভূত হবে, কেউ-বা ভক্তির ভান করবে— এই শ্রেণীর ব্যক্তি নিরস্তকুহক বাস্তব সত্যের কী সন্ধান রাখবে? এরা তো হাস্যরসের পাত্র। তথাকথিত তীর্থবাস, জাত গোঁসাইগিরি, ভাগবত পড়ে পেট চালানোর নামই লোক 'ভক্তি' বলে জানলো। কাকে বলে শুদ্ধ ভাগবতানুশীলন। বিদ্ধা বা মিশ্রাভক্তি, অবিদ্ধাভক্তি বা শুদ্ধভক্তির অনুসন্ধান লোক করুক, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রচার করুন।' এই জন্য প্রভুপাদ ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যের রাজধানীতে শাখা মঠ স্থাপন করলেন যা জগতে কেবল কৃষ্ণসম্বন্ধ বিজ্ঞান দানে জীবের মঙ্গল সাধন করবে। তিনি তাঁর ৬২ বছরের জীবনদশায় দেশে-বিদেশে ৬৪টি মঠ স্থাপন করেন। আর অধোক্ষজ তত্ত্বে নিপুণ তৈরি করেন প্রতিটি শিষ্যকে, যারা আজও সারা বিশ্বে দরিদ্র জীবকে কৃষ্ণপ্রেমধন দানে সুখী করে, ধনী করে চলেছেন। প্রভুপাদের শিষ্যবর্গ তাঁর অসীমগুণে গুণী হয়ে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন নামে তাঁর প্রারব্ধকাজের পতাকা বহন করে নিয়ে চলেছেন। কেউ গৌড়ীয় মঠ, কেউ চৈতন্য মঠ, কেউ গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ, তো কেউ ইসকন্‌ ইত্যাদি নাম নিয়ে সেই 'পরম বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনম্'-এর ধ্বজা বহন করছেন বহু শাখা-প্রশাখায়।

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবের (১৮৭৪-২০২৪) সার্ধ্বশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় মিশনের উদ্যোগে তিনবছর ব্যাপী ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত এবং বিদেশে তথা লন্ডন, আমেরিকা, কানাডা, জার্মানি, বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিপুলভাবে প্রচার, সেমিনার, প্রদর্শনী, ধর্মসভা, বিশ্ববৈষ্ণব সম্মেলন, উত্তর ও দক্ষিণ পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার শুভসূচনা হয়েছিল ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দের উপস্থিতিতে গত ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২, শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম পুরীতে। ভারত সরকার ও ইউনেস্কো শ্রীল প্রভুপাদের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী বছর (২০২৪-২০২৫)-কে 'সার্ধ্বশততমবার্ষিকী আবির্ভাব স্মরণ বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করেছে। এই উপলক্ষ্যে গত ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, ভারত মণ্ডপম্‌, নিউ দিল্লিতে 'সার্ধ্বশততমবার্ষিকী আবির্ভাব স্মরণ বর্ষ' উদ্‌যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শ্রীল প্রভুপাদের নামাঙ্কিত স্মারক মুদ্রা ও ডাকটিকিট উন্মোচন করেছেন। এই মহামহোৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠান গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ শুক্রবার কলকাতা মহানগরীস্থিত 'সায়েন্স সিটি মেইন অডিটোরিয়াম'-এ ভারতবর্ষের মহামান্য উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রীজগদীপ ধনকর প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। এই ধারাবাহিকতায় শ্রীল প্রভুপাদের ১৫১তম শুভ আবির্ভাব স্মৃতি মহোৎসব উপলক্ষ্যে গৌড়ীয় মিশন এবং ওড়িশার সমস্ত গৌড়ীয় মঠের আয়োজনে আগামী ১৩-১৪ আগস্ট, ২০২৫ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবতের গৌরবময় উপস্থিতিতে ওড়িশা প্রদেশের কটকে জওহরলাল নেহরু ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দুদিন ব্যাপী 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও গৌড়ীয় মিশন উদ্যোগে শ্রীল প্রভুপাদের স্মরণে মিশনের বিশেষ বিশেষ স্থানে তাঁর নামে স্মৃতিসৌধ স্থাপনের ব্যবস্থা করেছে। যথা—

১। শ্রীল প্রভুপাদ মিনি কনভেনশনাল সেন্টার, স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ। ২। শ্রীল প্রভুপাদ সোশিও-কালচারাল রিসোর্স সেন্টার, বাগবাজার, কলাকতা, পশ্চিমবঙ্গ। ৩। শ্রীল প্রভুপাদ মেমোরিয়াল হল, কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা। ৪। শ্রীল প্রভুপাদ সিনিয়ার সিটিজেন স্প্রিচুয়াল থেরাপি সেন্টার, পুরী, ওড়িশা। ৫। শ্রীল প্রভুপাদ পরাবিদ্যাপীঠ ও বৈদিক এডুকেশন সেন্টার, বালেশ্বর, ওড়িশা।

(লেখক গৌড়ীয় মিশনের সভাপতি ও আচার্য)

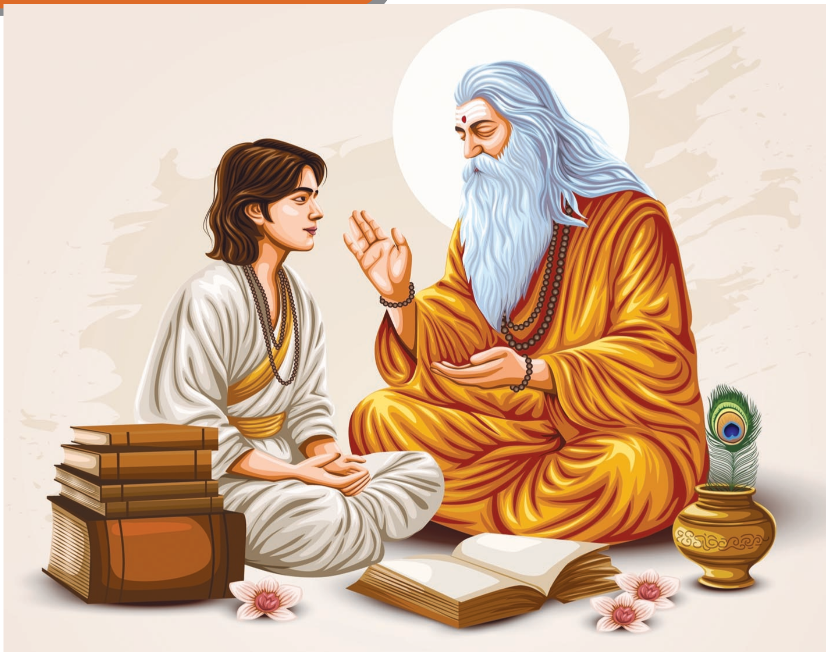

গুরুপূর্ণিমার তৎপর্য এবং গুরু-শিষ্যের ভূমিকা

শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী

ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দুধর্ম যে চারটি মূল স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তা হলো জন্মান্তরে বিশ্বাস, কর্মফলে বিশ্বাস, আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং গুরু পরম্পরা। ব্যক্তিজীবনে গুরু বা আচার্যের ভূমিকার কথা এবং তাঁর উপদেশাবলীর প্রয়োনীয়তার কথা ভারতবর্ষ সুপ্রাচীনকাল থেকে উপলব্ধি করে এসেছে। তাই আচার্য বা গুরুকে দেবতার আসনে বসিয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা করার কথা বলা হয়েছে বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে— মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, তেমনই আবার বলা হয়েছে— আচার্যদেবো ভব। পিতা, মাতা, অতিথি ও আচার্যকে দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। ভাগবত পুরাণে ভগবান বলেছেন, গুরুকে আমারই স্বরূপ বলে জানবে— আচার্যানাং মাং বিজানীয়াৎ।

ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজের কাছে গুরুপূর্ণিমা একটি পুণ্যতিথি। আষাঢ় মাসের পবিত্র পূর্ণিমাই গুরুপূর্ণিমা তিথিরূপে পরিচিত। জগদ্‌গুরু ভগবান ব্যাসদেব এই তিথিতে নারায়ণের অংশে ধরাধামে আবির্ভূত হয়ে আচার্য রূপে হিন্দুধর্মের প্রচার ও সংরক্ষণ করেছিলেন। মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা এবং বেদের বিভাজন করে, শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে সেগুলির প্রচারের ব্যবস্থা করে তিনি এক মহান কীর্তি স্থাপন করেছেন। আজ হাজার হাজার বছর ধরে হিন্দুসমাজ এই ধর্মগ্রন্থগুলির দ্বারা সঞ্জীবিত হয়ে চলেছে। তাই হিন্দুসমাজ ব্যাসদেবের আচার্যত্বকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁর আবির্ভাব তিথিকে অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে থাকে। এইদিন সবাই নিজ নিজ গুরুদেবকে ব্যাসাসনে স্থাপন করে গুরু পরম্পরা অনুযায়ী পূজা করে থাকে।

জাগতিক বিদ্যা থেকে ব্রহ্মবিদ্যা পর্যন্ত যেকোনো বিদ্যা অর্জনের জন্যই শিক্ষক বা আচার্যের প্রয়োজন রয়েছে। আর ভারতের মহান পুরুষগণ বরাবর নিজেদের জীবনে আচার্য বরণের আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। প্রাচীনকালে দ্বাদশবর্ষ সকলকেই গুরুগৃহে অবস্থান করে পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা (পারমার্থিক ও জাগতির) অর্জন করতে হতো। উভয় বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে, আচার্যের আশীর্বাদ নিয়ে শিষ্য যৌবনকালে সংসার জীবনে প্রবেশ করতেন। মাঝে মাঝে তাঁরা গ্রহণ করতেন গুরুদেবের উপদেশ এবং লাভ করতেন তাঁর পবিত্র সঙ্গ। তাই তখন ধর্মের অনুশাসনেই পরিবার ও সমাজ পরিচালিত হতো এবং স্বাভাবিকভাবেই ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত ছিল ধর্মরাজ্য।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁর ভাইদেরও উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে। কুলগুরু বশিষ্ঠদেব এসেছিলেন তাঁদের গুরুগৃহে নিয়ে যাবার জন্য। রাজা দশরথ বহুমূল্য বসন, দ্রব্যসামগ্রী ও রথের আয়োজন করেছিলেন রাজপুত্রদের জন্য। বশিষ্ঠদেব বাধা দিয়েছিলেন। রাজপুত্র হলেও সাধারণ বসন পরিধান করে এবং পদব্রজেই যেতে হবে অন্যান্য বালকদের মতোই। দ্বাদশবর্ষ গুরুগৃহে অবস্থান করে, সর্বপ্রকার বিদ্যা অর্জন করে রাজধানীতে ফিরে এসে পরবর্তীকালে শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করেছিলেন। রাজা হলেও তাঁদের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন কুলগুরু ঋষি বশিষ্ঠ।

আবার অত্যাচারী কংসকে বধ করে কংসের পিতা উগ্রসেনকে রাজসিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। মাতা দেবকী ও পিতা বসুদেবকে মুক্ত করেছিলেন কারাগার থেকে। কর্তব্যকর্ম সমাধা করে বালক শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যাত্রা করেছিলেন গুরুগৃহে। সন্দীপনী ঋষির আশ্রমে দ্বাদশবর্ষ অবস্থান করে সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তারপর ফিরে এসে সংসারজীবনে প্রবেশ করে শৌর্য, বীর্য, ত্যাগ ও প্রেমের মাধ্যমে রাষ্ট্রজীবনকে ধর্মপথে পরিচালিত করার গুরুদায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। স্বয়ং ভগবানকেও গুরুকরণের আদর্শ গ্রহণ করতে এবং গুরুগৃহে গুরু সেবার আদর্শ স্থাপন করতে হয়েছিল।

আবার আচার্য শঙ্কর উপনয়ন সংস্কারের পর পাঁচবছর বয়সে গিয়েছিলেন গুরুগৃহে অধ্যয়ন করতে। আটবছর বয়সে

গৃহত্যাগ করে নর্মদাতীরে এসেছিলেন। গুরু গোবিন্দপাদ তখন এক গুহার মধ্যে ধ্যানমগ্ন। তাঁর ধ্যানভঙ্গ হলে আত্মসমর্পণ করেছিলেন শ্রীগুরুর চরণে। তারপর দীক্ষা ও সন্ন্যাস নিয়ে কঠোর তপস্যায় জুটে গিয়েছিলেন আচার্য শঙ্কর। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের একজন বলিষ্ঠ আচার্য ও ধর্ম প্রচারক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন আচার্য শঙ্কর।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, বালানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ জীবনে আচার্য বরণ করেছিলেন এবং ধর্ম ও অধ্যাত্ম সাধনায় পূর্ণতা অর্জন করে আত্মনিয়োগ করেছিলেন দেশমাতৃকার সেবায়।

'গুরু' শব্দের দ্বারা আমরা সাধারণত আধ্যাত্মিক জগতের পথপ্রদর্শককেই বুঝে থাকি। কিন্তু জীবনের প্রাথমিক স্তর থেকে অন্তিম স্তর পর্যন্ত আমরা যাঁর কাছ থেকে সামান্যতমও কিছু শিখে থাকি, ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাঁকেও গুরুর সম্মান প্রদান করা হয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে মাতা-পিতা ও শিক্ষকগণও আমাদের কাছে গুরুস্থানীয়। তাঁদের উপদেশ ও শিক্ষার দ্বারাই সম্যকরূপে গড়ে ওঠে আমাদের জীবন। এরপর যদি কারুর মধ্যে ধর্মজিজ্ঞাসা ও অধ্যাত্মপিপাসা জাগ্রত হয়, তাহলে সাধনার উচ্চভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, অনুভূতিসম্পন্ন, সামর্থ্যবান কোনো আচার্যের চরণতলে তাকে অবশ্যই উপনীত হতে হবে। মুণ্ডক উপনিষদে (১।২।১২) এবিষয়ে এক অপূর্ব উপদেশ রয়েছে— তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেব অভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্। অর্থাৎ সেই পরমাত্মাতাকে জানবার জন্য সে (শিষ্য) হাতে সমিধ (হোমের কাঠ বা কোনো শ্রদ্ধার্ঘ্য) গ্রহণপূর্বক শ্রোত্রীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করবেন। উপনিদের এই মন্ত্রটির মধ্যে গুরু-শিষ্যর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। শিষ্যের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য গুরুর সান্নিধ্য লাভ করতে হবে; জাগতিক কোনো লাভের জন্য নয়। আর কেমন গুরুর কাছে যেতে হবে? শ্রোত্রীয় (শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ) এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ (ব্রহ্মজ্ঞ) আচার্যের নিকট যেতে হবে।

এরপর শ্রুতি বললেন, এই জ্ঞানবান গুরু তখন প্রশান্তচিত্ত, শমযুক্ত, সম্যকরূপে গুরুর অনুগত শিষ্যকে যে বিদ্যার দ্বারা সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে জানা যায়, সেই ব্রহ্মবিদ্যা কৃপাপূর্বক উপদেশ করবেন (মুণ্ডক উপনিষদ ১।২।১৩)। আচার্যের কৃপা ও উপদেশ ছাড়া শ্রেষ্ঠ ও সূক্ষ্মবিদ্যা 'ব্রহ্মবিদ্যা' লাভ করা যায় না। তাই ছান্দোগ্য উপনিষদ বললেন, আচার্যবান্ পুরুষো বেদ। অর্থাৎ যিনি আচার্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তিনিই সেই পরমাত্মাকে জানতে পারেন।

গুরু কোনো ব্যক্তিবিশেষ নন। গুরুশক্তি পরমাত্মারই একটি বিশেষ শক্তি যা কোনো ব্যক্তি, মূর্তি বা প্রতীকের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়ে আমাদের পথপ্রদর্শন করেন। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ একলব্যের জীবনের ঘটনা। ব্যাধপুত্র একলব্য অস্ত্রবিদ গুরু দ্রোণাচার্যের কাছে প্রার্থনা জানালেন তাকে অস্ত্রশিক্ষা দান করার জন্য। এবং এও জানালেন যে, দ্রোণাচার্যকেই তিনি অন্তরে গুরু রূপে বরণ করে নিয়েছেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় না হওয়ার জন্য দ্রোণাচার্য তাকে অস্ত্রশিক্ষা দিতে অস্বীকার করলেন। একলব্য কিন্তু নিজের সংকল্প থেকে বিচ্যুত হলেন না। অরণ্য মধ্যে দ্রোণাচার্যের মৃন্ময় মূর্তি স্থাপন করে নিত্য পূজা করতেন এবং সূক্ষ্ম আশীর্বাদ নিয়ে বাণ চালনা অভ্যাস করতেন। গুরুশক্তির কৃপায় একলব্য একদিন দ্রোণাচার্যের প্রিয়শিষ্য অর্জুনের থেকেও শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হয়ে উঠলেন। একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে দ্রোণাচার্য একদিন অনুসন্ধান করতে করতে উপস্থিত হলেন একলব্যের সাধনক্ষেত্রে। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কার কাছে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেছ? তোমার গুরু কে? একলব্য প্রণাম করে সবিনয়ে বললেন, আপনিই তো আমার গুরু। তারপর তার আরাধ্য মূর্তির কাছে দ্রোণাচার্যকে নিয়ে গেলেন। অবাক হলেন দ্রোণাচার্য, বুঝলেন, গুরুশক্তিই মূর্তির মধ্য দিয়ে একলব্যকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছে।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রতীকী উপাসনারও স্বীকৃতি রয়েছে। দেশভক্তি ও ব্যক্তি চরিত্রের ভিত্তিতে প্রকৃত মানুষ তৈরির কাজে যে প্রতিষ্ঠান ব্রতী আছে সেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কোনো ব্যক্তিগুরুকে নয়, পরম পবিত্র গৈরিক পতাকাকে গুরু হিসেবে বরণ করে নিয়েছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য, পরম্পরা, ত্যাগ, তপস্য এবং শৌর্যবীর্যের প্রতীক এই গৈরিক পতাকা। তাই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা প্রতিদিন গৈরিক পতাকার সামনে দাঁড়িয়ে বুকে হাত রেখে প্রার্থনা করেন এবং দেশভক্তি ও আদর্শ চরিত্র গঠনের শিক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীগুরুপূর্ণিমা তিথিতে স্বয়ংসেবকরা পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের দ্বারা দক্ষিণা সমর্পণ করেন গুরু গৈরিক পতাকার বেদীমূলে।

গুরু কেবল অধ্যাত্ম জীবনের পথপ্রদর্শক নন, তিনি রাষ্ট্রভক্তির ক্ষেত্রেও প্রেরণা দান করে থাকেন। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ তাঁর গুরু রামদাস স্বামীর প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর গুরুদেব নিজের উত্তরীয় দান করে বলেছিলেন, বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিও'। অর্থাৎ ত্যাগ ও রাষ্ট্রপ্রেমই তোমার আদর্শ হোক। তাঁর গুরু শুধু উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, বিধর্মীদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় সহযোগিতাও করেছেন।

গুরু নানকদেব প্রবর্তিত শিখপন্থের দশমগুরু গোবিন্দ সিংহ যেমন অধ্যাত্ম সাধনায় একজন দিকপাল ছিলেন, তেমনই একজন বীর যোদ্ধাও ছিলেন। ধর্মরক্ষায় তিনি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে বিধর্মী মুঘলদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। গুরু গোবিন্দ সিংহের পরে আর কোনো ব্যক্তি-গুরু হননি। সেই গুরুর স্থান গ্রহণ করেছেন গুরু গ্রন্থসাহেব। সকল ধর্মের সার কথা নিয়েই রচিত হয়েছে গুরু গ্রন্থসাহেব। এই গ্রন্থসাহেবই এখন গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত। স্বামী রামদাস এবং গুরু গোবিন্দ সিংহের নামে আজও সমগ্র ভারত শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করে।

প্রাচীনকালে ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রমুখ এবং বর্তমানকালে রামদাস স্বামী, গুরু গোবিন্দ সিংহ, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শঙ্করাচার্য, তথাগত বুদ্ধ প্রমুখ মহাপুরুষ নানাভাবে ব্যক্তিজীবন তথা রাষ্ট্রজীবনে আচার্যের ভূমিকা পালন করে গেছেন। আবহমানকাল থেকে গুরু-শিষ্যের মধুর সম্পর্কের পরম্পরাই ভারতবর্ষ তথা হিন্দুধর্মকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। একজনের আশ্রয় দান, অপরের সমর্পণ; একজনের পথপ্রদর্শন, অন্যজনের আজ্ঞাবহতা — এর মধ্যে দিয়েই অধ্যাত্মজ্ঞান ও রাষ্ট্রভক্তির সমন্বয় সাধন হয়েছে ভারতবর্ষে। □

শুধু পুশব্যাক নয়, অনুপ্রবেশ রোধে চাই আরও শক্ত অবস্থান

রঞ্জন কুমার দে

সম্প্রতি পুশব্যাক ইস্যুতে অসমের মুখ্যমন্ত্রী খুব কড়া অবস্থানে রয়েছেন। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের মুক্ত বিচরণ ভূমি হয়ে পড়েছে ভারত, সেই সঙ্গে রোহিঙ্গা ও পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীরা বাড়তি ইন্ধন জোগাচ্ছে। অনুপ্রবেশকারীরা এই প্রথম এভাবে ভারতে ঢুকছে তেমনটা নয়, এরা অনেক আগে থেকেই ভারতকে তাদের উপার্জন ভূমি বানিয়ে শিকড় গেড়ে বসে আছে। ভারতের ভোটব্যাংক রাজনীতি, সীমান্ত উদাসীনতা, আইনি ফাঁক, ইন্টেলিজেন্স নিষ্ক্রিয়তা ইত্যাদি এই অনুপ্রবেশের খোলাখুলি সুযোগ করে দিয়েছে। এদের নিয়মিত দালাল রয়েছে যাদের মাধ্যমে এই অনুপ্রবেশকারীরা ভারতে সহজে নকল সরকারি কাগজপত্র বানিয়ে আইনের চোখে ধুলো দিয়ে দিব্যি ভারতীয়দের সঙ্গে মিশে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানে ভাগ বসাচ্ছে। বাংলাদেশি, পাকিস্তানি, রোহিঙ্গা মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের রমরমা বেশ চলছে ভারতে বিগত কয়েক যুগ থেকে, কিন্তু কাশ্মীরের পহেলগাঁও জঙ্গিকাণ্ডের পর ভারত নড়েচড়ে বসায় তাদের ভাড়া ভাতে ছাই পড়ার উপক্রম।

মাত্র কয়েক সপ্তাহে সারা ভারতে ধরপাকড় শুরু হওয়ায় কয়েক হাজার বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি মুসলমান ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে। কিন্তু এই সংখ্যাটা মূল অনুপ্রবেশকারীদের ১ শতাংশও নয়। এরা মূলত ভারতে অনুপ্রবেশ করে সমাজ বিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়ে এবং সেখানকার জনবিন্যাসে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে স্থানীয়দের অসুবিধার মুখে ঠেলে দেয়। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে শাসকদলের নেতারা এই অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে নিয়ে শুরু করে নির্মম সাম্প্রদায়িক হিংসা এবং স্থানীয় হিন্দুদের হত্যা। এরা মূলত অসম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানা দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে, এরপর স্থানীয় ভোট ব্যবসায়ীরা তাদের লুফে নিয়ে নিজেদের ভোটব্যাংক মজবুত করে এবং নকল কাগজপত্র তৈরি করে দেয়। এরকম অনেক ঘটনা মিডিয়ার সামনে এসেছে। কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ থেকে সেলিমুদ্দিন নামে এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে বিএসএফ গ্রেপ্তার করলে জানা যায় সে বাংলাদেশের কক্সবাজারের বাজেরপাড়ার বাসিন্দা। আশ্চর্য হলেও সত্যি, এই অনুপ্রবেশকারী বিগত চার বছরে মুর্শিদাবাদে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে সেখানে দর্জির দোকানের কাজের পাশাপাশি সে এক স্থানীয় মসজিদে ইমামগিরি করছে এবং মজহবি শিক্ষা দিয়েছে। মমতা সরকারের কাছ থেকে দিব্যি ইমাম ভাতাও পেয়েছে।

উত্তর-পূর্ব ভারত এই অনুপ্রবেশকারীদের প্রবেশপথ হলেও পশ্চিমবঙ্গ তাদের জন্য স্বর্গরাজ্য। অনুপ্রবেশকারীদের মুক্তাঞ্চল পশ্চিমবঙ্গকে বলা হচ্ছে, কারণ কেবল রানাঘাট জেলায় মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে ৪৯০ জন অনুপ্রবেশকারী গ্রেপ্তার হয়েছে। বর্ধমানে বাংলাদেশি সন্দেহে শফিকুল নামে এক যুবককে পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয় জনতা। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত স্বীকার করে যে সে বাংলাদেশের যশোহর জেলার সহরসা থানার রুদ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা। ২০০১ সালে সে ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশ করে স্থানীয় সিপিএম নেতা রেশন কার্ড বানিয়ে দিলে পরবর্তীতে সে ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান কার্ড ইত্যাদি বানিয়েছে। আসলে ভোটব্যাংকের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গকে মিনি বাংলাদেশ বানিয়ে রেখেছেন শাসক দলের নেতারা। কমিউনিস্টদের পরে তৃণমূলের হাত ধরে সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। নিউটন নামে এক তৃণমূল কর্মীকে বাংলাদেশের কোটা সংস্কার আন্দোলনে দেখা গিয়েছে, যার পশ্চিমবঙ্গের কাকদ্বীপ বিধানসভা এবং বাংলাদেশে দুই জায়গার ভোটার কার্ড রয়েছে। এই অনুপ্রবেশকারীরা শুধু পশ্চিমবঙ্গ কিংবা অসমে নয়, এরা সারা ভারতের সব রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এদের শেকড় অনেক গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। এরা সুযোগমতো পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে যায় কিংবা দীর্ঘমেয়াদি ভিসা বানিয়ে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপে পাড়ি জমায়।

এরা খুব ভালোভাবে ভারতের আইনি মারপ্যাঁচের সব ফাঁক জানে, কারণ ওদের পেছনে রয়েছে শাসকদলের নেতা, কিছু নামি এনজিও এবং আইনজ্ঞ। এরা অনুপ্রবেশকারীদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আইনি আশ্রয় দেয়। ভারতের সেকুলারিজম ও মহানুভবতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এরা ভারতেই থেকে যায়, দীর্ঘমেয়াদি আইনি ফাঁকে বিচারব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একটা সময় কোনোভাবেই প্রমাণ করা যায় না এরা প্রকৃতপক্ষে বিদেশি নাগরিক। কিংবা

প্রমাণ হলেও সেই সংখ্যাটা একেবারে নগণ্য। তাই বিকল্প ব্যবস্থা বেছে নিতে বাধ্য ভারতের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের প্রশাসন।

সম্প্রতি অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অনুপ্রবেশকারীদের রুখতে ১৯৫০ সালের দ্যা ইমিগ্রান্টস (এক্সপালসন ফর্ম অসম) অ্যাক্ট অর্থাৎ অভিবাসী, (অসম থেকে বহিষ্কার) নির্দেশ ১৯৫০-কে কার্যকারী করে প্রত্যেক জেলাশাসককে বিদেশি শনাক্তকরণ ও বহিষ্কারের দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন। এখন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিনশো অনুপ্রবেশকারীকে অসমের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে পুশ ব্যাক করা হয়েছে এবং আগামীতে এই প্রক্রিয়া আরও তীব্রতর হবে তা সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায় জীবন পেরিয়ে যায় কিন্তু বিদেশিদের বিতাড়ন করা সম্ভব হয় না। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ অনুপ্রবেশকারীদের বহিষ্কার পদ্ধতি খুব জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি। অসমে বিদেশি শনাক্তকরণের জন্য কংগ্রেস শাসনকালে ১৯৬৪ সালের বিদেশি আইনের অধীনে ১৯৬৪ সালে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল অর্ডার জারি করা হয়।

অনুপ্রবেশকারী হিসেবে সন্দেহ হলে সরকারকে প্রথমে এই ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে যেতে হয়। এখানে বহু বছর গড়িয়ে রায় অভিযুক্তের বিপক্ষে গেলে তাদের কাছে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের দরজা খোলা থাকে। এরপরও থাকে আরও জটিলতা। অনুপ্রবেশকারীদের তাদের নিজের দেশের বৈধ কাগজপত্র জোগাড় করে সে দেশকে বুঝিয়ে দেওয়া পাহাড়সম কঠিন কাজ। তাই এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে সরকারের নিকট ভরসা ১৯৫০ সালের দ্যা ইমিগ্রান্টস (এক্সপালসন ফর্ম অসম) অ্যাক্ট অর্থাৎ তাদের তড়িঘড়ি বহিষ্কার করা। পুরানো এই আইনটিতে অসম থেকে বহিষ্কারের কথা বলা হলেও সেই আইন উত্তরপূর্ব-সহ পুরো ভারতে কার্যকরী আছে। এই আইনানুসারে ভারতের বাইরের কোনো দেশের নাগরিক যদি ১৯৫০ সালের নির্দেশটি বলবৎ হওয়ার আগে বা পরে অসমে এসে থাকে এবং সেই ব্যক্তির অসমে বসবাস যদি কোনো কারণে ভারতের সাধারণ নাগরিকদের স্বার্থ পরিপন্থী হয়, তাহলে ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ কোনো কর্মচারী তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীর 'বিদেশি ভাগাও'-র কঠোর নীতিতে অসমের অনুপ্রবেশকারী-হিতাকাঙ্ক্ষীদের মাথায় বিনা মেঘে বজ্রপাত হওয়ার উপক্রম। তাঁদের মতে অসম সরকার ২০১৮ সালে একটি হলফনামায় সুপ্রিমকোর্টকে লিখিত দিয়েছিল যে ২০১৩ সালের পর অসমে আর কোনো পুশব্যাকের ঘটনা হয়নি, তাই আজকের এই পুশব্যাক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বেআইনি। তারা এটাও দাবি করছেন বিদেশি বহিষ্কৃতরা আসলে ভারতীয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে কোনো বিদেশিকে চিহ্নিত ও প্রত্যার্পণ করতে অসম সরকারকে প্রতিবার আদালতের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক নয়, কেননা অভিবাসী (অসম থেকে বহিষ্কার) নির্দেশ ১৯৫০ এখনো বলবৎ আছে। মুখ্যমন্ত্রীর যুক্তি যেহেতু অসমে ঘোষিত ৩০ হাজার অনুপ্রবেশকারী রয়েছে এবং অনেকে সেই রায়ের বিপক্ষে কোনো হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে যাননি, তাই তাদের বিতাড়ন করতে অসুবিধা কোথায়! মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিধানসভায় দাঁড়িয়ে স্বীকার করেছেন যে এই ঘোষিত অনুপ্রবেশকারীরা কীভাবে বাঁকা পথে নিজেদের ভোটার কার্ড, প্যানকার্ড, আঁধার কার্ড বানিয়ে নিয়েছে।

তাই এদের যত তাড়াতাড়ি পুশব্যাক করা যায় ততই মঙ্গল। ট্রাইব্যুনাল বিচারব্যবস্থা কোনোভাবেই সমসাময়িক পরিস্থিতিতে মানানসই নয়। কারণ প্রায় প্রতিদিনই বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গারা সীমান্তবাহিনীর কাছে ধরা পড়ছে, নতুবা বিভিন্ন অসামাজিক কাজে এদের নাম উঠে আসছে। তাই এতো লোককে জেলে রেখে দেওয়া শুধু ব্যয়বহুল নয় বরং স্থানসংকটও বটে। বিএসএফের সূত্রমতে, সীমান্তে ২০২৩ সালে ১৫৪৮ জন এবং ২০২৪ সালে ১৮২৬ জন অনুপ্রবেশকারীকে তাহারা হাতেনাতে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছেন। দীর্ঘ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অনেক জায়গায় কাঁটাতার নেই, রয়েছে দালাল সিন্ডিকেট। টহলদারিতে নেই উপযুক্ত সীমান্ত বাহিনী। তাই এই যে অনুপ্রবেশকারী আটক হচ্ছে এরা প্রকৃত অনুপ্রবেশকারীদের ১০ শতাংশও নয়। এরা শুধু জীবিকার খোঁজে নয়, বরং তাহারা গজওবা হিন্দের দুঃস্বপ্ন বাস্তবায়নে ভারতে অনুপ্রবেশ করছে এবং তাদের পূর্ণ সমর্থনে রয়েছে ভারতের ভোটভিখারি রাজনৈতিক দল এবং তাদের সমর্থক জেহাদিরা।

ফেরত পাঠানো বাংলাদেশের বাসিন্দা দিনাজপুরের তরিকুল ইসলাম বলেন— ভারতে যাই কারণ সেখানে পাথর ভাঙার কাজ সব সময় পাওয়া যায়। মাসে ১৮-২০ হাজার ভারতীয় টাকা পাওয়া যায়। থাকা খাওয়ার খরচও কম, ফলে টাকা হাতে থাকে। সে এও জানায় তাঁর গ্রামের আরও লোক এভাবে জীবিকার সন্ধানে ভারত গিয়েছে। বাংলাদেশে এরকম কাহিনির অভাব নেই যারা কাজের সন্ধানে পরিবার নিয়ে অবৈধভাবে ভারতে পাড়ি জমিয়েছে। তাই যারা দাবি করেন প্যুশব্যাক ব্যবস্থায় সাধারণ ভারতীয়দের হয়রানি করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্যুশব্যাক প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে ১৯৫০ সালের 'ইমিগ্রেন্টস এক্সপালসন ফর্ম অসম' আইনকে কার্যকরী করতে চাইছে অসম সরকার। কিন্তু এর প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে ১৯৬৪ সালের বিদেশি ট্রাইব্যুনাল অর্ডার। তাই এখন অসমের সাধারণ মানুষ অনুধাবন করতে পারছেন, সাধারণ এই নির্দেশে তাঁদের সঙ্গে এতদিন ছল করা হয়েছে এবং তাদের ট্রাইব্যুনালের নামে বিদেশি অনুপ্রবেশকারীর বোঝা বিগত কয়েক দশক থেকে টানতে হচ্ছে। অনুপ্রবেশরোধে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্যুশব্যাক প্রক্রিয়া একমাত্র সঞ্জীবনী। অন্যথায় ইউরোপ, আমেরিকার মতো অনুপ্রবেশকারীদের ডাস্টবিনে পরিণত হবে ভারত ও অসম এবং ভবিষ্যতে নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ হারিয়ে এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া বিকল্প আর কোনো পথ খোলা থাকবে না। □

অনুপ্রবেশরোধে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্যুশব্যাক প্রক্রিয়া একমাত্র সঞ্জীবনী। অন্যথায় ইউরোপ, আমেরিকার মতো অনুপ্রবেশকারীদের ডাস্টবিনে পরিণত হবে ভারত। হারিয়ে যাবে নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ।

ধর্ম, সম্প্রদায় এবং ভারতীয় সাধনা

স্বামী সত্যানন্দ

প্রবন্ধটিতে ভগবান, ধর্ম ও রিলিজিয়নের আলোচনা করা হয়েছে। আমরা হামেশাই এই শব্দগুলি ব্যবহার করি। প্রকৃতপক্ষে এগুলি বহু ব্যবহারে ক্লিশে। এদের সঠিক অর্থ অনেকেরই বোধগম্য নয়। আবার এমন অনেকেই আছেন যাঁরা এই শব্দগুলির কদর্থও করে থাকেন। তাই প্রথমেই এই শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ বুঝে নিলে প্রবন্ধটির যথার্থ ভাব বুঝতে সুবিধা হবে।

ভগবান :

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ
ইতীরণ।। (বিষ্ণুপুরাণ)

ঐশ্বর্য, বীরত্ব, যশ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য— এই ৬টি গুণ যাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, তিনিই ভগবান।

উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব
ভূতানাম্ অগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যাম্ অবিদ্যাম্ চ স
বাচো ভগবানমিতি।।

সবকিছুর সৃষ্টি ও বিনাশ, সমস্ত প্রাণীর ভালো-মন্দ সবকিছু, বিদ্যা ও অবিদ্যার প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন যিনি, তিনিই ভগবান।

ধর্ম :

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম লক্ষণম্।। (মনুস্মৃতি)

ধৃতি (সঠিক ধারণ ক্ষমতা), ক্ষমা, দম (মন ও শরীরের সংযম), অস্তেয় (চুরি না করা), শুচিতা (অন্তর-বাহ্য উভয়বিধ শুচিতা), ব্রহ্মচর্য, মেধা, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ (কিছুতেই সংযম হারিয়ে রাগ না করা) —এই ১০টি ধর্মের লক্ষণ।

রিলিজিয়ন (Religion) :

Religion is relationshp between a man and his maker. স্রষ্টা ও নিজের মধ্যকার সম্পর্কই রিলিজিয়ান (সম্প্রদায় বা উপাসনা পদ্ধতি)

সম্প্রদায়ের জন্য আবশ্যিক :

(১) স্রষ্টা বা প্রবর্তক—যিনি কোনো বিশেষ মতের উদ্ভাবক ও প্রচারক।

(২) উপাসনা পুস্তক— যে বইয়ে ওই সম্প্রদায় সম্বন্ধে সব লেখা থাকবে।

(৩) উপাসনাস্থল— যেখানে ওই মতাবলম্বীরা তাদের স্রষ্টাকে ডাকবে।

(৪) অনুগামী— ওই সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী।

স্পষ্টতই নির্দিষ্ট গণ্ডিবদ্ধ এক চিন্তাধারার কথা এতে আছে। ধর্ম কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। ধর্ম আকাশের মতো উদার। অসীম এর ব্যাপ্তি। ধর্মের আদিও নেই অন্তও নেই। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি ধর্মের প্রবর্তক নন।

প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই ধর্ম দ্বারা আবৃত। ধর্ম সনাতন। সনাতন কথাটির অর্থ— যা অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। খাঁটি সত্যি কথা এই যে, জন্মসূত্রে পৃথিবীর সবাই সনাতনী। পরে কোনো সম্প্রদায়ের দ্বারা সংস্কৃত হয়ে ওই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়। ধর্মের পরিভাষা রিলিজিয়ন নয়।

বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ, গীতা, চণ্ডী, ব্রহ্মসূত্র এইসব গ্রন্থে ধর্মের কথাই আছে। কোনো সম্প্রদায়ের কথা বলা নেই। তাই এইসব গ্রন্থ সকলেরই। পক্ষান্তরে ত্রিপিটক, আবেস্তা, বাইবেল, কোরান প্রভৃতি একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের গ্রন্থ।

সম্প্রদায়ের খপ্পরে পড়লে কী হয় তার একাধিক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কিছু একদেশদর্শী, তথাকথিত দ্বৈতবাদী অদ্বৈততত্ত্বের সাধকদের নানা সমালোচনা করে গিয়েছেন। অকারণ, অহেতুক নিন্দা ইত্যাদি করেছেন, যা একেবারেই কাম্য নয়।

তবে কী অদ্বৈতবাদী বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, বেদব্যাস, শুকদেব, গৌড়পাদ, গোবিন্দপাদ, আচার্য শঙ্কর, মধুসূদন সরস্বতী, তোতাপুরী, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ সবাই মূর্খ?

এটি সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতার একটি ছোট্ট উদাহরণ।

Semitic Thought and Semitic Culture (সেমিটিক থট অ্যান্ড সেমিটিক কালচার) অর্থাৎ পরমত অসহিষ্ণু চিন্তাধারা

এবং তা থেকে উদ্ভূত সংস্কৃতি একদেশদর্শী। খুবই সংকীর্ণ।

এদের মতে :

(ক) (১) আমার মতই সঠিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

(২) বাদবাকি সব ভুল।

(৩) ওসব নরকের পথ।

(৪) আমার পথে না চললে মুক্তিলাভ হবে না— কিছুতেই হবে না।

(খ) (১) আমার মত গ্রহণ করো।

(২) নাহলে তোমার বাঁচার অধিকার নেই।

(৩) তোমাকে হত্যা করার নির্দেশ শাস্ত্র আমাকে দিয়েছে।

(৪) তোমাকে হত্যা করলে আমার পুণ্য হবে— আমি স্বর্গে যাবো।

এই পৃথিবীতে এরাই নৈরাজ্যের জনক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এরা কেবল ধ্বংস করেছে— আজও করে যাচ্ছে।

এরা জানে না :

(১) ভগবানের বহুবচন হয় না।

(২) ধর্মেরও বহুবচন হয় না।

(৩) 'ধর্ম'-এর কোনো বিকল্প নেই।

(৪) সম্প্রদায় মতবাদ মাত্র— ধর্ম নয়, কিছুতেই কখনো নয়।

কিন্তু এরা : (১) সম্প্রদায়কে ধর্ম বলে চালাচ্ছে।

(২) সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপকে ধর্মীয় অনুশাসন বলে প্রচার করছে। আমাদের পুণ্যভূমি ভারতেই আছে ধর্ম— যা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই।

তাই হিন্দুরা : (১) অসাম্প্রদায়িক।

(২) হিন্দুদের আদর্শ— বসুধৈব কুটুম্বকম— পৃথিবীর সবাই আমার আত্মীয়— আমার ভাই।

স্বামীজীর শিকাগো ভাষণে বলেছেন— 'সর্বধর্মের প্রসূতি-স্বরূপ যে সনাতন হিন্দুধর্ম, তাহার প্রতিনিধি হইয়া আমি আজ আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং কী বলিব পৃথিবীর হিন্দুজাতির ও যাবতীয় হিন্দু মত-পথের কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর হইয়া আমি আজ আপনাদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ জানাইতেছি।'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন— 'হিন্দু ধর্মই সনাতন ধর্ম। ইদানীং যে সকল ধর্ম দেখছ এসব তার ইচ্ছাতে চলে যাবে— থাকবে না। তাই আমি বলি, ইদানীং যে সকল ভক্ত, তাদেরও চরণেভ্যো নমঃ। হিন্দুধর্ম বরাবর আছে আর বরাবর থাকবে।'

(শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৬-৮৭, ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ মে ২০০৭, পৃষ্ঠা ৬৭৮)

গ্রীক ভাষায় 'স' নেই। তাই সিন্ধু নদকে তারা বলতো হিন্দু নদ। সেই নদীর দেশ হিন্দুস্থান। সেই দেশের ধর্ম হিন্দুধর্ম। সেই দেশের জাতি হিন্দুজাতি। এই হিন্দুধর্মই সনাতন ধর্ম। বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতিতে একে ধর্ম বলা হয়েছে। ক্রমে গ্রিকদের হিন্দু বলা থেকে এটি বর্তমানে হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত। হিন্দুরা সম্প্রদায় নয়; তাই কোনোদিনই সাম্প্রদায়িক হতে পারে না।

কিন্তু চারপাশের ঠগের পাল্লায় পড়ে হিন্দুদের বুদ্ধি ভ্রম হয়েছে। প্রচারের ঢক্কানিনাদে আমরা নিজেদের সম্প্রদায় ভাবছি। দশচক্রে ভগবান ভূতের মতো আমরা দুনিয়াজোড়া ঠগের পাল্লায় পড়ে হিরা ফেলে দিয়ে কাচকে সর্বস্ব জ্ঞান করছি। আমাদের অমূল্য সম্পদ ধর্মকে (যা পৃথিবীর আর কোথাও নাই) বাদ দিয়ে অন্যের মতো নিজেদেরও সম্প্রদায় ভাবছি। সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে নিজেরে সঁপে দিয়েছি। আমাদের বিচারবুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

কিন্তু সত্যের আলোকে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে। প্রথমে মোগল-পাঠানরা (পড়ুন মুসলমানরা), পরে ইংরেজ-ফরাসি- পর্তুগিজরা (পড়ুন খ্রিস্টানরা) আমাদের এই মহান দেশকে ছলে-বলে- কৌশলে বিশ্বাসঘাতকতায় দখল করেছে। বলাৎকার, ধর্মান্তরণ, অত্যাচার, প্রলোভন, কৌশলী অপপ্রচার, পেশীশক্তির আস্ফালন সবকটির জোরে তারা অন্যায় ভাবে এই মহান দেশকে কবজা করেছে। অলীক আর্যতত্ত্ব (আজ সবাই জেনে গেছে এটি মিথ্যা), সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্ব, ফায়দা লোটার জন্য দু-দুটি রাজনৈতিক দল (পড়ুন কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি) গঠন, মেকলীয় ফাঁদপাতা শিক্ষাতত্ত্ব, ইতিহাস বিকৃত করার সঙ্ঘবদ্ধ ষড়যন্ত্র— এসবের দ্বারা এদেশকে টুকরো টুকরো করে আমাদের সর্বনাশের সব রকম বীজ বপন করে গেছে বেনের জাত ইংরেজ।

আজ হিন্দুরা বিবেকবুদ্ধি বর্জিত আত্মঘাতী হয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। নিজেরা সিংহ। কিন্তু নিজেদের ভাবছি ভেড়া।

এ থেকে মুক্তির পথ আত্মশক্তির জাগরণ। ধর্ম হিন্দুদের জাতির প্রাণভোমরা-আত্মা। জাতীয়তাই ধর্ম। জাতীয়তাই আত্মশক্তি।

দেশ আমাদের কাছে ভূমিখণ্ড মাত্র নয়— দেশ আমাদের মা। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। মাকে কখনো কাটাছেঁড়া করা যায় না।

অখণ্ড ভারতবর্ষ— এক দেশ।

সবার জন্য এক আইন— এক বিধান।

জাতির পরিচয় জাতীয় পতাকা— এক নিশান।

যারা এ দেশকে মাতৃভূমি মনে করে এ দেশ তাদেরই— এটি ধ্রুব সত্য।

সত্যের কখনো প্রত্যব্যয় হয় না। এই সত্যতে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনায় সিদ্ধিলাভ আমাদের করতেই হবে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত।

নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। □

পঞ্চতন্ত্রের গল্প

নবাঙ্কুর

লেজকাটা শেয়াল

একবার এক শেয়াল শিকারির ফাঁদে ধরা পড়ে। ধরা পড়ার পর যখন সেই শিকারি তাকে মারতে উদ্যত হয় তখন শেয়াল অতি করুণ স্বরে নিজের প্রাণ ভিক্ষা চাইতে থাকে। বার বার করুণস্বরে মিনতিতে শিকারির মনে দয়ার সঞ্চার হলো। ছেড়ে দিতে যাবে এমন সময় শিকারির সঙ্গীরা বলল, একে এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। এর লেজটা কেটে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হোক। সকলে হইহই করে শেয়ালের লেজটি কেটে নিয়ে ছেড়ে দিল।

শেয়ালটি তো কোনোমতে প্রাণ নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচল। কিন্তু তার পরেই তার মনে হতে লাগল, এই লেজ কাটা অবস্থায় যদি তার জ্ঞাতিভাইয়েরা দেখে ফেলে, তাহলে তো লজ্জা আর অপমানের শেষ থাকবে না। তার থেকে তার মরে যাওয়াই ভালো। এখন আর কী করা যাবে?

তারপরও সে দিন-রাত ভাবতে লাগল, কীভাবে নিজের মানসম্মানের অন্তত কিছুটা বাঁচানো যায়। অবশেষে তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে সোজা নিজের জ্ঞাতিভাইদের কাছে চলে এল। তাদের ডেকে বলল, দেখ ভাইয়েরা, আমি এতদিনে খুব ভালো একটা অভিজ্ঞাতা অর্জন করেছি। সেকথা বলার জন্যই আমি তোমাদের ডেকেছি। দেখ, আমি নিজের লেজ কেটে ফেলেছি। এতে যে কী সুবিধা তা তোমাদের বলে বোঝাতে পারবো না। দিব্যি স্বচ্ছন্দ শরীরে হালকাভাবে ঘুরে বেড়াতে পারছি। অবশ্য এটাও ঠিক যে, নিজে একদম প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা না করতাম, তাহলে আমিও কোনোভাবেই এই সুবিধাটা বুঝতে পারতাম না। যেহেতু আমি নিজে এত সুখ অনুভব করছি, তাই তোমাদেরও সেই সুখের অংশীদার করতে চাই। তাই বলছি তোমরাও নিজের নিজের লেজ কেটে ফেল।

লেজকাটা শেয়াল আবার বলতে লাগল, ভেবে দেখ, লেজ থাকলে কী জঘন্য দেখতে লাগে। চলতে ফিরতেও পদে পদে অসুবিধা হয়। অকারণ একটা বোঝা বয়ে বেড়াতে হয়, যা কিনা কোনো কাজেই লাগে না। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, এতদিন কীকরে আমরা এই কদাকার লেজটা বয়ে বেড়িয়েছি?

লেজকাটা শেয়ালের কথা শুনে সবাই তাজ্জব হয়ে গেল। সবাই কানাঘুসো করতে লাগল। প্রায় সবাই ভাবতে লাগল, তাই তো, এত সোজা বিষয়টা এতদিন কেন আমাদের মাথায় আসেনি? এই শেয়ালটা খুব বুদ্ধিমান, ভাগ্যিস, আজ আমাদের এই কথাটা আজ বলল। এ খুব মহৎপ্রাণ বন্ধু আমাদের। এত খাঁটি কথাটা তো আমাদের না বলে নিজেই আরামে থাকতে পারত।

সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল।

লেজকাটা শেয়াল তো খুব খুশি। যাক, ঠিকমতো ব্যাপারটা সামাল দেওয়া গেছে। এখন যদি সবকটা শেয়াল নিজের নিজের লেজ কেটে ফেলে, তাহলে আর নিজের সম্মান খোয়ায়োর কোনো ব্যাপারই থাকবে না।

জ্ঞাতিভাইদের মধ্যে গুনগুন ফিসফিস শুনে শুনে লেজকাটা খুব খুশি হয়ে উঠল। সে আবার উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, দেখ, বন্ধুরা, নিজে পরীক্ষা দেখেছি বলেই তোমাদের একথা বলছি। তাই এখনিই তোমরা নিজের নিজের লেজ কেটে ফেল। লেজ না থাকলে কী আরাম তা এখনই বুঝতে পারবে।

তখন এক বৃদ্ধ শেয়াল উঠে দাঁড়াল। লেজকাটা শেয়ালকে উদ্দেশ্য করে বলল, ভাই, সব তো বুঝলাম। তবে তোমার লেজটা যদি কোনোভাবে ফিরে পাবার সম্ভাবনা থাকত, তাহলে তুমি কি আমাদের লেজ কাটতে বলতে? তখন লেজকাটার মুখটা ম্লান হয়ে গেল। বৃদ্ধ শেয়াল সবাইকে বলল, এই ধূর্ত ফাঁদে পড়ে নিজের লেজ হারিয়েছে, আর এখন সবাইকে লেজ কেটে ফেলতে বলছে। সবাই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে লেজকাটাকে দল থেকে তাড়িয়ে দিল।

পৃথ্বীরাজ সেন

জাতীয় উদ্যান

ব্ল্যাকবাক

ব্ল্যাকবাক জাতীয় উদ্যানটি গুজরাট রাজ্যের ভাবনগর জেলায় খাম্বাত উপসাগরের তীরে অবস্থিত। এই উদ্যান ভেলাভাডার কৃষ্ণসার ন্যাশনাল পার্ক নামেও পরিচিত। পার্কটি ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩৪ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এই উদ্যানে মূলত কৃষ্ণসার হরিণের সংখ্যাধিক্য থাকলেও ভারতীয় নেকড়ে, ডোরাকাটা হায়না, শেয়াল, সোনালি শেয়াল, বনবেড়াল, বন্যবরাহ, খরগোশ এবং বিভিন্ন প্রজাতির ইঁদুর রয়েছে। রয়েছে ১২০০ প্রজাতির পাখি। এই উদ্যান মূল এক বিশাল তৃণভূমি। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন সরীসৃপ প্রজাতি, যেমন, কোবরা, করাত স্কোলড ভাপিার, ক্রেইট, র‍্যাট স্নেক ইত্যাটি। বর্ষাকালে পর্যটকদের জন্য এই উদ্যান বন্ধ থাকে।

এসো সংস্কৃত শিখি-৭৩

সংখ্যাপাঠঃ

२१–২১ एकविंशतिः, २२–২২ द्वाविंशतिः।

२३–২৩ त्रयोविंशतिः, १४–২৪ चतुर्विंशतिः।

२५–২৫ पञ्चविंशतिः, २६–২৬ षड्विंशतिः।

२७–২৭ सप्तविंशतिः, २८– ২৮अष्टविंशतिः।

२९–৩৯ नवविंशतिः, ३०–৩০ त्रिंशत्।

३१–৩১ एकत्रिंशत्, ३२–৩২ द्वात्रिंशत्।

३३–৩৩ त्रयत्रिंशत्, ३४–৩৪ चतुस्त्रिंशत्।

३५–৩৫ पञ्चत्रिंशत्, २६–৩৬ षट्त्रिंशत् ।

२७–৩৭ सप्तत्रिंशत्, २८–৩৮अष्टत्रिंशत्।

२९– ৩৯ नवत्रिंशत् ४०–৪০ चत्वारिंशत्।

ভালো কথা

পিতৃ-মাতৃপূজন

গত ৪ এপ্রিল আমাদের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মাদপুর রূপা সরস্বতী শিশু মন্দিরে পিতৃ-মাতৃপূজনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেদিন আমরা শিশু মন্দিরের ভাই-বোনেরা আমাদের বাবা-মাকে বিদ্যালয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। সবাই নিজের নিজের মা-বাবাকে আসনে বসিয়ে তাঁদের চরণে ফুল দিয়ে পূজা করে প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি করার পর চারবার প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করলাম। তারপর তাঁদের মিষ্টিমুখ করালাম। বাবা-মা-ও আমাদের মিষ্টি খাইয়ে দিলেন। পূজা শেষ হলে আমাদের এক দাদাভাই বললেন, মা-বাবা আমাদের শ্বাসে- প্রশ্বাসে রয়েছেন। যখন আমাদের পায়ে কাঁটা ফুটে যায় তখন আমাদের মুখ থেকে আপনা থেকেই 'মাগো' শব্দ বেরিয়ে আসে। আবার যখন সাপ বা ভয়ের কিছু দেখি তখন মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে 'বাবা গো'। এতেই প্রমাণ হয় আমাদের প্রথম ভগবান হলেন আমাদের মা-বাবা।

শৌর্য দত্ত, তৃতীয় শ্রেণী, অভিরামপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) বী অ ক্ষ ণ

(২) স জ্ঞা বা অ

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) থি তি ৎ র অ স কা

(২) ন জ্ঞা ন স্মা স ত্ম আ

১৬ জুন সংখ্যার উত্তর

(১) মহাসাগর (২) লজ্জাজনক

১৬ জুন সংখ্যার উত্তর

(১) নরনারায়ণ (২) নকশালবাড়ি

(১) কৃত্তিকা মণ্ডল, মকদুমপুর, ইবি, মালদা। (২) শ্রেষ্ঠা দত্ত, অভিরামপুর, পঃ মেদিনীপুর। (৩) দীপশিখা রায়, বনগাঁ, উ: ২৪ পরগনা। (৪) মলয় সরদার, ক্যানিং, দ: ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

★ RETIREMENT PLANNING.
★ CHILDREN EDUCATION FUND.
★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
★ WEALTH CREATION.
★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406
Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com
NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের জনক

বটু কৃষ্ণ হালদার

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে নাকি শ্যামাপ্রসাদের কোনো অবদান ছিল না— এরকম একটা মেঠো ভাষণ সংসদে শোনা গেছে। এটা অজ্ঞতা না মিথ্যা জানি না। তবে প্রকৃত ইতিহাস অন্য কথা বলছে। ব্রিটেনের যে প্রধানমন্ত্রী ভারতকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন সেই ক্লিমেন্ট এটলিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনাদের সিদ্ধান্তের পিছনে মোহনদাস গান্ধীর ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলনের কতটা ভূমিকা ছিল? উত্তরে এটলি শুধু বলেছিলেন, ‘minimal’. আজ এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে ব্রিটেন ভারতকে স্বাধীনতা দিয়েছিল, কারণ তারা তাদের ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। এবং এর কারণ নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং মুম্বাইয়ের নৌবিদ্রোহ।

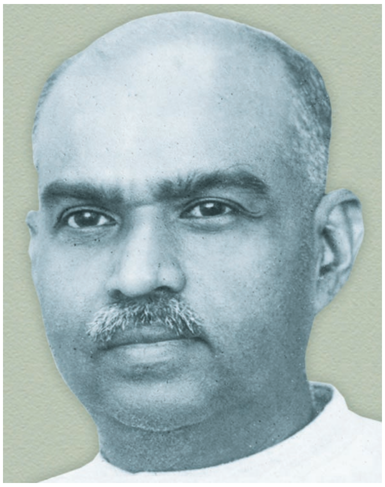

ড. শ্যামাপ্রসাদের আসল কৃতিত্ব পাকিস্তানের গ্রাস থেকে পশ্চিমবঙ্গকে ছিনিয়ে আনা। নেহরু-গান্ধী যখন ক্ষমতার লোভে দেশভাগে রাজি হয়ে গেলেন তখন শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন, ভারত ভাগ করলে বঙ্গকেও ভাগ করতে হবে, বাঙ্গালি হিন্দুরা ইসলামি শাসনে জিম্মি হয়ে থাকবে না। একাজে তিনি কংগ্রেসকেও সঙ্গে পেলেন এবং সফলকাম হলেন। যদি বঙ্গকে তিনি সেদিন ভাগ না করতেন বর্তমানে হিন্দুদের অবস্থা কী হতো বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন অনুধাবন করা যাবে। বাংলাদেশের কথা ছেড়ে দিন, একটু ভাবুন এই পশ্চিমবঙ্গের কথা। আজকে যারা হেটো বক্তৃতা করছেন তারা মনে রাখলে ভালো করবেন যে, সেদিন যদি শ্যামাপ্রসাদ না থাকতেন তাহলে তারা ভারতের নাগরিকই থাকতেন না, তাদের অবস্থা হতো পাকিস্তান ও বাংলাদেশের হিন্দুদের মতো।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা এসেছে দেশভাগের মধ্য দিয়ে। এই স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল ভিত্তিস্থান ছিল বঙ্গপ্রদেশ। আর হাজার হাজার বাঙ্গালি স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল— দেশ একদিন স্বাধীন হবে। ভারতের ইতিহাসে স্বাধীনতা আন্দোলনে বঙ্গপ্রদেশের অবদান অনস্বীকার্য, সেকথা বোধহয় বলার দরকার নেই। যাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল কাণ্ডারি তাঁরাই এ ভারতবর্ষে বর্তমানে অবাঞ্ছিত অবহেলিত জাতিতে পরিণত হয়েছে। যে বাঙ্গালি স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে নোবেল, অস্কার সর্বক্ষেত্রে উচ্চতার শিখরে ছিল, সেই বাঙ্গালিদের জন্য নিজস্ব হোমল্যান্ড পেতে অনেকটাই বেগ পেতে হয়েছিল। যদি বঙ্গের অন্যতম বীর সন্তান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় না এগিয়ে আসতেন তাহলে পুরো বঙ্গ পাকিস্তানের গ্রাসে চলে যেত। ভারত ভেঙে তৈরি হয়েছে পাকিস্তান। এই সময়েই পশ্চিমবঙ্গ নামে এই অঙ্গ রাজ্যের জন্ম হয়েছে।

মার্চ, ১৯৪৭। দেশভাগ আসন্ন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, বাঙ্গালি হিন্দুদের কী হবে? মুসলিম লিগ দাবি তুলেছে, বঙ্গপ্রদেশকে পাকিস্তানে চাই। সেই দাবি মেনে গোটা বঙ্গ পাকিস্তানে তুলে দিলে হিন্দুর ভবিষ্যৎ কী হবে? ডোডো পাখির মতো বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া? কলকাতায় ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে এবং তারপরে নোয়াখালি গণহত্যায় হিন্দু নিধন যজ্ঞ ততদিনে হয়ে গিয়েছে, লোকের মুখে মুখে প্রবচন চালু হয়ে গেছে, ‘সোহরাওয়ার্দির নরক’। কী হবে তাহলে?

উত্তর দিতে, বাঙ্গালি হিন্দুকে বাঁচাতে এগিয়ে এলেন একজন। ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি ঘোষণা করলেন, যে কোনো জাতির মতোই বাঙ্গালি হিন্দুরও আত্মনিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। মুসলিম লিগ যেমন আজ পাকিস্তান চায়, বাঙ্গালি হিন্দুও নিজেদের হোমল্যান্ড চায়। কিন্তু এই দাবির বৈধতা কোথায়? শ্যামাপ্রসাদের দাবি যে বাঙ্গালি হিন্দুর দাবি, তার প্রমাণ কোথায়? শ্যামাপ্রসাদের হাত শক্ত করতে, জাতির প্রয়োজনে, সেই সঙ্কটাপন্ন মুহূর্তে এগিয়ে এলেন বাঙ্গালি হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা, সেইসঙ্গে এগিয়ে এলেন অমৃতবাজার পত্রিকার কর্ণধার। ২৩ মার্চ, ১৯৪৭। অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হলো সেই ঐতিহাসিক সমীক্ষার কথা। একটি মাত্র প্রশ্ন, আপনি কি পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের জন্য পৃথক হোমল্যান্ড চান?

প্রথমে ঠিক করা হয়েছিল, ৭ এপ্রিল, ১৯৪৭-এর মধ্যে অমৃতবাজারের পাঠকদের উত্তর পাঠাতে হবে। কিন্তু পাঠকদের আবেদনে সেই সময়সীমা বর্ধিত করা হলো, ১৫ এপ্রিল, ১৯৪৭ অবধি। উত্তরগুলির স্ক্রুটিনি করার দায়িত্ব দেওয়া হলো তৎকালীন বিখ্যাত চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট কোম্পানি— গুপ্ত অ্যান্ড মিত্র মেসার্সকে। সেই সঙ্গে স্বেচ্ছায় স্ক্রুটিনি করার দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এলেন বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট সুরেন্দ্র মোহন বসু। পাশাপাশি চললো আরেকটি প্রক্রিয়া। শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে তারকেশ্বরে বসলো বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার অধিবেশন। গোটা বঙ্গ থেকে ৪০০ জন প্রতিনিধি তাতে অংশগ্রহণ করলেন এবং ৫০ হাজার মানুষের সমাগম প্রত্যক্ষ করলো সেই অধিবেশন। সভাপতি হিসেবে ভাষণে নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বললেন, ‘বাঙ্গালি হিন্দুর মরণ-বাঁচনের প্রশ্ন’। বাঙ্গালি হিন্দুদের বাঁচাতে হবে।

শ্যামাপ্রসাদকে সমর্থন জানাতে বক্তব্য রাখলেন, আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সমর্থন করলেন মেঘনাদ সাহা, যদুনাথ সরকার প্রমুখ বুদ্ধিজীবী। বাঙ্গালি হিন্দুর পৃথক হোমল্যান্ড চাই, সনৎ কুমার রায়চৌধুরী ও সূর্য কুমার বসুর পেশ করা প্রস্তাব বিপুল সমর্থনে পাশ হয়ে গেল। ১০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রস্তুত হলো। চুপ রইল না বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেসও। ৪ এপ্রিল, ১৯৪৭-এ বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেসের একটি মিটিং

ফ ঃ ৬

আহ্বান করা হলো, যাতে আমন্ত্রণ জানানো হলো ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে। সেই মিটিঙে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, ক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগী, নলিনীরঞ্জন সরকার, প্রমথনাথ ব্যানার্জি, মাখনলাল সেন, অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ। একই মর্মে 'বাঙ্গালি হিন্দুর পৃথক হোমল্যান্ড চাই'— এই প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

জাতির স্বার্থে হাত মেলালো বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভা ও বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস। এই প্রস্তাবের প্রচারে সর্বমোট ৭৬টি সভা অনুষ্ঠিত হলো, যার মধ্যে ৫৯টি কংগ্রেসের উদ্যোগে ১২টি হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে ও ৫টি যৌথভাবে। কিন্তু একই সঙ্গে সবার চোখ ছিল অমৃতবাজার পত্রিকার সমীক্ষার দিকে। কী হতে পারে ফলাফল? পত্রিকার অফিস উত্তরের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছিল। শুধু কি উত্তর, সেই সঙ্গে নিজেদের মতের সমর্থনে অসংখ্য চিঠি। যুক্তবঙ্গের প্রস্তাবে সায় দেওয়া এবং শেয়ালের কাছে কুমিরছানা জমা রাখা যে একই জিনিস— বাঙ্গালি হিন্দু তা সেদিন ভালোই বুঝেছিল। পরের ঘটনাগুলি ঘটলো খুব দ্রুত। ২২ এপ্রিল দিল্লির প্রকাশ্য সমাবেশে শ্যামাপ্রসাদ ব্যাঘ্রগর্জনে বাঙ্গালি হিন্দুর পৃথক হোমল্যান্ডের দাবি জানালেন জনসমক্ষে এবং ঘোষণা করলেন, গোটা বঙ্গকে পাকিস্তানে পাঠানোর চক্রান্তের প্রতিবাদ স্বরূপ ২৩ এপ্রিল বাঙ্গলা বনধ্ পালন করা হবে। এদিকে অমৃতবাজার পত্রিকা ঘোষণা করলো ২৩ এপ্রিলই তারা সমীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করবে। গোটা বঙ্গ সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলো সেই দিনের।

২৩ এপ্রিল পত্রিকায় সমীক্ষায় ফলাফল প্রকাশিত হতেই উল্লাসে ফেটে পড়লো বাঙ্গালি হিন্দু। নিশ্চিন্ত হলেন শ্যামাপ্রসাদ। বাঙ্গালি হিন্দুর পৃথক হোমল্যান্ডের দাবির সমর্থনে বাঙ্গলি তার রায় জানিয়ে দিল। পাঁচ লক্ষ কুড়ি হাজারেরও বেশি বাঙ্গালি, বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড গড়ার প্রস্তাবকে সমর্থন জানালেন। তিন হাজার জন বিপক্ষে ভোট দিলেন। ছয় হাজার ভোটার স্লিপ টেকনিক্যাল ভুলের কারণে বাতিল করা হলো। মোট ভোটারদের মধ্যে অমুসলমান ৯৯.৬ শতাংশ, আর মুসলমান ০.৪ শতাংশ যা প্রমাণ করে বাঙ্গালি হিন্দু এবং অমুসলমান ভোটাররা প্রায় সবাই এই প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন। ভোটারদের মধ্যে পুরুষ ৯৩.৬ শতাংশ, মহিলা ৬.৪ শতাংশ।

সমীক্ষাকে সার্টিফায়েড করলো গুপ্ত অ্যান্ড মিত্র চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট কোম্পানি। তৎকালীন কলকাতার মিশন রো এক্সটেনশন, ইউন্ডসর হাউসে ছিল এদের অফিস। তাঁরা লিখলেন, ইতিহাস বলে, ২৩ এপ্রিল, ১৯৪৭, শ্যামাপ্রসাদের আহ্বানে সেই ঐতিহাসিক বনধ্ সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল। একমাত্র অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি ব্যতিরেকে সব দল একে সমর্থন করেছিল। এমনকী শ্যামাপ্রসাদের আহ্বানে এবং উপস্থিতিতে কলকাতার ট্রাম ডিপোর শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মীরাও সিটুর নির্দেশ অগ্রাহ্য করে বনধ্ পালন করেছিলেন।

১৪ মে, ১৯৪৭ অরেকটি সাপ্লিমেন্টারি ফলাফল প্রকাশ করেছিল অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৫ এপ্রিলের পরে প্রাপ্ত উত্তরগুলির ওপর ভিত্তি করে। সেখানে ৭০ হাজার ৬১৮টি ভোটের মধ্যে ৭০ হাজার ৫০টি ভোট অর্থাৎ ৯৮.৭৭ শতাংশ ভোট পড়েছিল 'হ্যাঁ'-এর পক্ষে, ২৯১টি ভোট অর্থাৎ ০.৪১ শতাংশ ভোট পড়েছিল 'না'-এর পক্ষে। ৫৮১টি ভোট টেকনিক্যাল কারণে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। হিন্দু ভোটার ৯৯.৮ শতাংশ ও মুসলমান ভোটার ০.২ শতাংশ। শেষবাক্যে বিদ্রূপ করেছিল পত্রিকা, 'It is noteworthy that all Muslims polled in favour of partition, but not in favour of partition of Bengal।

আশ্চর্যজনকভাবে ২০ জুন বঙ্গীয় বিধানসভায় যখন বিপুল সংখ্যাধিক্যে পশ্চিমবঙ্গ গঠনের প্রস্তাব পাশ হয়েছিল, যে ২১ জনের ভোট প্রস্তাবের বিপক্ষে পড়েছিল, তারা সবাই মুসলমান ও বঙ্গ ভাগের বিপক্ষে থেকে শ্যামাপ্রসাদের বিরোধিতা করা, কমিউনিস্ট পার্টির দু'জন বিধায়ক জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণ পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন। কারণ, 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' নীতিটি তাঁরা ভালোভাবেই জানতেন। ইতিহাস এভাবেই বিশ্বাসঘাতক ও সুবিধাবাদীদের চিনিয়ে দেয়। তবে হিংসার রক্ত দিয়ে গড়া পাকিস্তান ও বাংলাদেশ উভয়ই মুসলমান দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে পরিচিত। উভয় দেশে হিন্দু প্রায় শূন্য হওয়ার পথে। আর হিন্দুদের হোমল্যান্ড বলে যে রাজ্যটি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে আত্মপ্রকাশ করেছে, সেই পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালি হিন্দুদের অস্তিত্ব টিকিয়ে থাকার আবার লড়াই শুরু হয়েছে। ভূমিপুত্র হিন্দু বাঙ্গালিরা নিজেদের রাজ্যে যেমন উদ্বাস্তুতে পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। বাঙ্গালি হিন্দুদের হোমল্যান্ড ফিরে পেতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং তার অনুগামীদের অনেকটা লড়াই করতে হয়েছিল। বহু চড়াই-উৎরাই ও কাঙ্ক্ষিত লড়াইয়ের ফলাফল বাঙ্গালি হিন্দুদের হোমল্যান্ড এই পশ্চিমবঙ্গ। সেই পশ্চিমবঙ্গ বহিরাগত, সন্ত্রাসবাদী, দাগি আসামি, খুনি, অনুপ্রবেশকারী জেহাদি মুসলমানদের স্বর্গরাজ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই সঙ্গে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ঝুপড়ি সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। যারা পশ্চিমবঙ্গে অবৈধভাবে রাজনৈতিক স্বার্থে ঠাঁই পেয়েছে তারা কী বুঝবে বাংলাভাষার মর্ম। তারা কোনোদিন বুঝবে না স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের লড়াইকে। অচিরেই যেন এই পশ্চিবঙ্গের লাগাম আসতে চলেছে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী, দাগি আসামি আর জেহাদিদের হাতে। তখন কীভাবে বাঁচবে বাঙ্গালির ভাষা, সংস্কৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজীদের মূর্তি?

কিছু রাজনৈতিক দল ভোটব্যাংকের স্বার্থে তাদের দিচ্ছে অবাধ সুযোগ সুবিধা। যার ফলশ্রুতি হিসেবে পাচ্ছি নারী নির্যাতন, জমি দখল, বুথ দখল, বোমাবাজি, সন্ত্রাস, তোলাবাজি, কর্মক্ষেত্রে দখলদারি, আর ভূমিপুত্র বাঙ্গালিরা হয়ে যাচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিক। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের ভূমিপুত্ররা সমস্ত দিক থেকে বঞ্চিত, অবহেলিত, উপেক্ষিত। সমস্ত কর্মক্ষেত্রে বহিরাগত অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের রমরমা। আপনার-আমার ভাতের থালায় থাবা বসিয়েছে উগ্র হায়নার দল। তাতেই ভূমিপুত্র হিন্দুরা নিজের জন্মভিটে ছাড়া হতে চলেছে, এর দায় হিন্দু বাঙ্গালিদেরও নিতে হবে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্নের পশ্চিমবঙ্গের এমন বেহাল দুর্দশার জন্য বাঙ্গালি কোনো প্রতিরোধ গড়ে তোলেনি। যে সরকার এসব নোংরামো, অরাজকতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, বাঙ্গালি ভূমিপুত্ররা সবকিছু জেনে শুনেও এই সরকারকে যোগ্য সঙ্গত দিচ্ছে।

শুধু ভূমিপুত্র নয়, বাংলা ভাষা চরম অবহেলিত এই বঙ্গে। বাঙ্গালি নিজেই বাংলা ভাষায় কথা বলতে লজ্জা বোধ করে। বাঙ্গালি যেমন ভুলতে বসেছে প্রাণের ভাষা, মুখের ভাষা, সাহিত্যের ভাষা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সেই সঙ্গে, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ঠিক যেমন ভাবে ভুলে গেছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এর অবদান। বাঙ্গালির প্রাণের বাংলা ভাষা হারিয়ে যাবে একটু একটু করে আর উর্দু কিংবা হিন্দি ভাষা আপনার দরজায় কড়া নাড়তে চলেছে। বাঙ্গালি তাদের এই ভুমিটুকু হারাবে— যদি সচেতন না হয়। □

রাষ্ট্রনেতা মোদীজীর প্রধানমন্ত্রিত্বের এগারো বছর

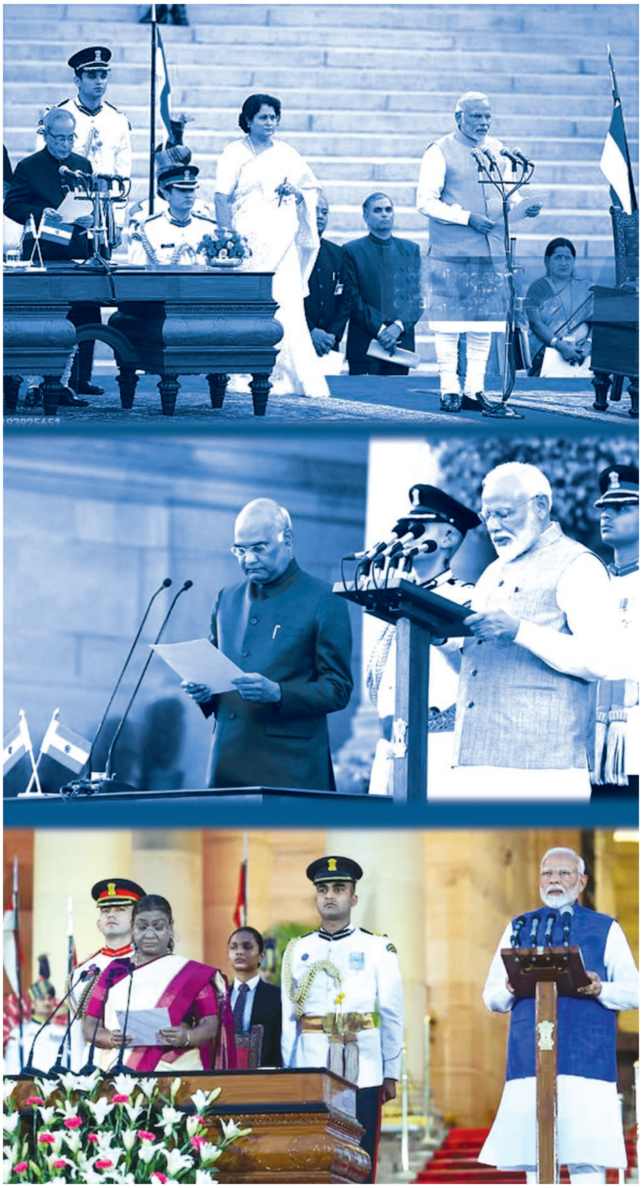

অমলেশ মিশ্র

সকলেই জানি যে, কালের বিচারে এগারো বছর কোনো সময় নয়। আবার এও শুনেছি--- কীর্তির্যস্য স জীবতি। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী কীর্তির জন্যই কালের গর্ভে হারিয়ে যাবেন না, চিরকাল দেশবাসীর মনের মণিকোঠায় বেঁচে থাকবেন।

শ্রীমোদীর পূর্বতন প্রধানমন্ত্রীদের একটা স্লোগান থাকত মাত্র, কিন্তু সেই স্লোগানের রূপায়ণে কোনো সঠিক দিশা পাওয়া যেত না। আমাদের দেশে অনেক রাজনৈতিক নেতা ১৯৪৭ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে এসেছেন, গিয়েছেন। কিন্তু রাষ্ট্রনেতা খুব অল্প সময়ের জন্য অটলবিহারী বাজপেয়ীকে দেখেছিলাম। এখন ১১ বছর ধরে মোদীজীকে দেখছি। আরও অন্তত চার বছর দেখার সুযোগ ও সৌভাগ্য হবে।

রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে রাষ্ট্রনেতার অন্তত ২টি বিষয়ে তফাত উল্লেখ করা যায়। (১) রাজনৈতিক নেতা পরবর্তী নির্বাচন অর্থাৎ মাত্র পাঁচ বছরের কথা ভাবেন। কিন্তু রাষ্ট্রনেতা আগামী প্রজন্মের কথা ভাবেন। দেশ ওই সময়ে বিশ্বে কোন স্থানে পৌঁছবে তার কথা ভাবেন। (২) রাজনৈতিক নেতারা শুধু পরবর্তী পাঁচ বছরে দলকে জেতানোর কথা ভাবেন, পুরো দেশের জন্য কোনো পরিকল্পনা থাকে না। দেশের থেকে পরিবারকে সমৃদ্ধ করার চিন্তা থাকে। দেশের জন্য কোনো লক্ষ্য, দিশা ও মূল্যবোধ থাকে না। রাষ্ট্রনেতাদের লক্ষ্য, দিশা ও মূল্যবোধ থাকে। তাঁদের মন্ত্রীসভার সদস্যরা দুর্নীতিগ্রস্ত হন না, পরিবারকে সমৃদ্ধ করার কথা না ভেবে দেশকে সমৃদ্ধ করার কথা ভাবেন। লক্ষ্য, দিশা ও মূল্যবোধকে সমন্বিত করতে পারলে একজন নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর মতো রাষ্ট্রনেতাকে পাওয়া যায়।

মোদীজী প্রধানমন্ত্রী হয়েই ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে সর্বোচ্চ স্থানে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প করেন এবং সেই মতো কাজ শুরু করেন। কাজের লক্ষ্য— সবকা বিকাশ— সবকা সাথ এবং সবকা বিশ্বাস— সবকা প্রয়াস। মেক ইন ইন্ডিয়া, ভোকাল ফর লোকাল। ফলে এখন ভারত নিজের উদ্যোগেই শুধু প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদন করছে না, মহাকাশ অভিযানেও নিজের সর্বাধিক সাফল্য প্রতিষ্ঠিত করেছে— চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে উপস্থিত হয়ে।

নরেন্দ্র মোদী লক্ষ্য রেখেছেন ভারতের আর্থিক উন্নতি। ভারতকে তৃতীয় স্থানে নিয়ে যাওয়া। এই ১১ বছরের মধ্যেই ভারত এখন চতুর্থ স্থানে পৌঁছেছে। ১৯৫২ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত ভারতের অবস্থান ছিল বিশ্বের একাদশ স্থানে। এখন জাপানকে অতিক্রম করতে পারলেই তৃতীয় স্থানে আসবে ভারত। ভারতের নিজস্ব ম্যানুফ্যাকচারিং বা উৎপাদন ব্যবস্থা প্রায় ছিলই না। সমস্ত বিষয়েই বিদেশের উপর নির্ভর করতে হতো। এই ১১ বছরে ভারত এখন নিজেই উদ্ভাবন ও উৎপাদন করতে পারে। কোভিড টিকার ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বের সামনে নিজেকে প্রমাণ করেছে। ১০ বছর আগে ভারত আমাদানি করত ৯৫

শতাংশ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম। এখন করে মাত্র ২৭ শতাংশ। ভারতের ব্রহ্মাস্ত্র অন্যান্য দেশ কিনতে চায়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের তথ্য অনুযায়ী সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অর্থনীতি আমেরিকার ৩০ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার, তারপরে চীন ১৯ লক্ষ ২৩ হাজার কোটি মার্কিন ডলার, জার্মানি ৪.৭৪ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার, চতুর্থ দেশ ভারতবর্ষ ৪.১৯ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার। বিগত ১০ বছরের মধ্যে ভারতের ৩০ কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার বাইরে এসেছে। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা যাবে।

সাধারণত রাজনৈতিক নেতারা সিদ্ধান্ত নেন একতান্ত্রিকভাবে আর সেই সিদ্ধান্ত রূপায়ণ করতে চান একতান্ত্রিকভাবে। অন্যদিকে রাষ্ট্রনেতারা সিদ্ধান্ত নেন গণতান্ত্রিকভাবে এবং রূপায়ণ করেন গণতান্ত্রিকভাবে। তার ফলে রাজনৈতিক নেতারা দুর্নীতি ও পরিবারের উন্নতিতে সিদ্ধিলাভ করেন। আর রাষ্ট্রনেতারা দুর্নীতি বন্ধ করেন এবং সমগ্র দেশের উন্নতি করেন।

রাষ্ট্রনেতা হিসেবে মোদীজী ভারতীয় সংস্কৃতিই অনুসরণ করেন— বসুধৈব কুটুম্বকম্— সারা বিশ্বই আমার আত্মীয়। তাই কোভিডের টিকা যেমন সারা বিশ্বকে দিয়েছেন, তেমনই ইরান থেকে ভারতীয় ছাত্রদের ফিরানোর সময় শ্রীলঙ্কা ও নেপালের ছাত্রদেরও এনেছেন।

ভারতীয় সংস্কৃতি বলে— সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ। সর্বে সন্তু নিরাময়া— সকলেই সুখী থাক, সকলেই সুস্থ থাকুক। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন— যুদ্ধ নয়, তার আগেই আলোচনা ও কূটনীতির সাহায্যে সমস্যার সমাধান সম্ভব। তিনি বিশ্বকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে চান। ভারতের ক্ষেত্রে শুধু সন্ত্রাসবাদী নয়, যারা মাওবাদী হয়ে দেশের মধ্যে আছেন তাদেরও সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে হবে, অন্যথায় ধ্বংস করতে হবে। ২০১৬-এর মার্চের মধ্যে ভারতকে মাওবাদীমুক্ত করা হবে। আর সন্ত্রাসবাদীরা সন্ত্রাস বন্ধ না করলে অপারেশন সিঁদুরের মতো আবার কিছু হবে।

নরেন্দ্র মোদী তাঁর নীতির জন্যই আজ বিশ্ববন্দিত। তাঁকে তথা ভারতকে এখন সারা বিশ্ব মান্যতা দেয়। তিনি যেন আমাদের কবির কথাই গদ্যে বলছেন— ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। ভারতীয় আদর্শ মেনে তিনি অহিংসার পূজারি কিন্তু অধর্ম নাশ করার জন্য রুদ্ররূপও বটে। মোদীজী ভারতীয় এই আদর্শেও বিশ্বাসী যে যথা ধর্ম তথা জয়। দেশ আমাদের জননী। তাই দেশ সর্বোপরি। রাজনৈতিক নেতারা রাষ্ট্রনেতা হতে পারেন না। কারণ তাঁরা অন্তরে দেশভক্তি রাখেন না। বিদেশে গিয়ে নিজ স্বার্থে দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কথা বলেন।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর কথায় ধরুন, যিনি বলতেন— আমি শিক্ষায় ইংরেজ, সংস্কারে ইসলাম, দৃষ্টিভঙ্গীতে আন্তর্জাতিক আর দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দু। তাঁরা তিন প্রজন্ম— কন্যা, নাতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তাঁরা কি ভারতবর্ষকে নিজের মা ভাবতেন? ভারতে মন্ত্রী পর্যায়ে দুর্নীতি শুরু হয়েছে নেহরুর সময় থেকেই। তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্য অভিযুক্ত হন। এরা দেশকে নিয়ে ভাববার সময়ই পান না। বছর দুয়েক একজন সত্যিকার ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হন— কিন্তু তিনি বিদেশে নিহত হন। কোনো অনুসন্ধান হয়নি সেই মৃত্যু নিয়ে। তিনি প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী। এক সময় এলেন পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত দেশ সেবক। কিন্তু তিনিও নিহত হলেন। অনেককাল পরে পাওয়া গেল অটলবিহারী বাজপেয়ীকে— ১৩ দিন প্রধানমন্ত্রী, ১৬ মাস প্রধানমন্ত্রী, তারপর প্রায় ছ' বছর প্রধানমন্ত্রী। পোখরানে পরীক্ষামূলক পরমাণুবোমা ফাটিয়ে ভারতকে পরমাণু শক্তিধর দেশ বানিয়ে দিলেন। গুরুত্ব দিলেন সংযোগ ব্যবস্থায়, ফোন-মোবাইল, সড়ক। নদী সংযোজনের পরিকল্পনা। কিন্তু সময়াভাবে হয়নি।

তারপর দেখা গেল দেশভক্ত রাষ্ট্রনেতা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মোদীজীকে। এই ১১ বছর দেশ উন্নয়ন এবং ব্যক্তি উন্নয়ন দুটি করেছেন সব্যসাচীর মতো। ভারতকে আত্মনির্ভর করা তাঁর মূল লক্ষ্য। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো— ভারতের মুসলমান ভোটাররা নরেন্দ্র মোদীকে কী চোখে দেখেন ঠিক বলতে পারা যাচ্ছে না। তবে একথা বলা যায়, বিশ্বের ৭টি ইসলামি দেশের সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছেন মোদীজী।

বাজপেয়ীজীর অনুসরণে— বিমান পথ, রাজপথ, রেলপথ, আয়ুষ্মান ভারত, কৃষক সম্মাননিধি ইত্যাদি বহু প্রকল্প সার্থকরূপে পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্বের ১০তম অর্থনীতি থেকে ১০ বছরে বিশ্বের চতুর্থ অর্থনীতির দেশ হয়েছে। তিনি একজন রাষ্ট্রনেতা বলেই এতসব সম্ভব হয়েছে। □

শোকসংবাদ

দক্ষিণ কলকাতার বিজয়গড় শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক প্রশান্ত কুমার করঞ্জাই গত ২০ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। শ্রীকরঞ্জাইয়ের জন্ম অবিভক্ত ভারতের পূর্ববঙ্গের ঢাকা বিক্রমপুরের পাইকপাড়া গ্রামে। দেশভাগের সময় তাঁরা সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন। তিনি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের নিজের পরিবারের সদস্য বলে মনে করতেন।

* * *

তারকেশ্বর জেলার মশাট খণ্ডের মুণ্ডলিকার কোদালপুর গ্রামের স্বয়ংসেবক হুগলী বিভাগ শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখ পলাশ ঘোষের বাবা পাঁচুগোপাল ঘোষ গত ২৯ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি সহধর্মিণী, ১ পুত্র ও নাতিকে রেখে গেছেন।

* * *

পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম-২ খণ্ডের হাটমাধবপুর শাখার স্বয়ংসেবক তথা সঙ্ঘের পূর্বপ্রচারক নবকুমার মণ্ডলের মা গীতা মণ্ডল গত ২৩ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। তিনি ৫ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার প্রথম সঙ্ঘচালক প্রয়াত জগদীশ ঘোষের সহধর্মিণী ছবি ঘোষ গত ২৭ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

অমৃতলোকে সঙ্ঘ-প্রচারক উত্তম মাহাতো

জয়রাম মণ্ডল

সালটা ১৯৮৬। বাঁকুড়া জেলার খাতড়াতে বিস্তারক থাকার সময় বালক উত্তমের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। অদ্বৈতদা সদ্য বাঁকুড়া জেলা প্রচারক থেকে পরিবর্তন হয়ে কোচবিহার জেলার দায়িত্ব নিয়ে তাঁর কর্মক্ষেত্রে চলে গেলেন। পরবর্তীতে দীনেন দে জেলা প্রচারকের দায়িত্ব নিয়ে এলেন। তিনি আমাদের সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়েছিলেন। তারপর বুদ্ধদেবদা জেলা প্রচারক হয়ে আসেন। তখন অমল ঘোষ খাতড়া মহকুমা প্রচারক।

অমলদা আমাকে নিয়ে গেলেন হেত্যাপাথর গ্রামে গোপেশ্বর মাহাতোর বাড়িতে। বাড়িতে গিয়ে দেখি চার জন তরুণ-বালক-শিশু— উত্তম, গৌতম, পুরুষোত্তম আর শিবম। রাত্রিতে একসঙ্গে খাওয়া, তাদের সঙ্গেই শোওয়া। ভোরবেলা স্তোত্রপাঠ, তারপর শাখায় যাওয়া। শাখায় বালকদের সংখ্যা বেশি। গ্রামে উত্তমের বাবা গোপেশ্বর মাহাতো আর করালী মাহাতো প্রভাবী স্বয়ংসেবক। তাদের কথায় গ্রামের সব বাড়ি থেকেই বালক-শিশু-তরুণরা শাখায় আসে। শাখা বেশ জমজমাট।

হেত্যাপাথরের পাশের গ্রাম বারগ্রাম শাখার স্বয়ংসেবক বর্তমান সহক্ষেত্র প্রচারক জলধর মাহাতো। এই শাখাগুলিতে বহু প্রচারক— সুনীলদা, অদ্বৈতদা, বুদ্ধদেবদা, সুকেশদা নিয়মিত গিয়েছেন, থেকেছেন। তাঁদের প্রেরণায় উত্তম মাহাতো নিজেকে এক যোগ্য প্রচারক রূপে তৈরি করেছিল। পুরুলিয়া, বীরভূম, আন্দামান, মুর্শিদাবাদে যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছে। পরে কল্যাণ আশ্রমের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের দায়িত্ব অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছে। কল্যাণ আশ্রমের দায়িত্ব উত্তমের মনের মতো ছিল। বিভিন্ন সময়ে একথা উত্তম অনেকবার প্রকাশও করেছে। সংস্কারিত বাড়ির সংস্কারিত স্বয়ংসেবক উত্তম। ওর বাবা এক সময় মহকুমা কার্যবাহের দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে ওর ভাই গৌতম দক্ষিণ বাঁকুড়া জেলা কার্যবাহের দায়িত্ব পালন করছে। কলকাতায় থাকলে উত্তম স্বস্তিকা কার্যালয়ে এসে আমাদের সঙ্গে মনের কথা বলত। প্রচারক পঙ্কজ মণ্ডল উত্তমকে খুব স্নেহ করত। প্রচারক তাপস বারিক ওর প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে একজন। মাঝে মধ্যেই স্বস্তিকায় একসঙ্গে রান্না-খাওয়া হতো।

বাগানে ফুল তো অনেক ফোটে, কিন্তু সব ফুল ভগবানের চরণে স্থান পায় না। তেমনি দেশমাতৃকার চরণে পূজার অর্ঘ্য হিসেবে সকলে কাজে লাগে না। মাঝে মধ্যে মনে হয়, আমাদের

হিন্দু সমাজে অনেকেই তো উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শুধু পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ থেকে যায়। কিন্তু উত্তম পরিবারের বড়ো ছেলে হয়েও দেশ-ধর্ম-সমাজের কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিল। দেশমাতৃকার চরণে পুষ্প রূপে নিজেকে সমর্পিত করেছিল। ওর বাবা বলতেন, ঈশ্বরের কাজে ভালো জিনিসটাই দিতে হয়, তাই আমার যোগ্য ও বড়ো ছেলেকে সঙ্ঘের কাজে দিয়ে দিলাম।

সাধারণ পরিবারের হয়েও অসাধারণ উচ্চ দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন উত্তমের বাবা। উত্তমও বড়ো মনের প্রচারক ছিল। বনবাসী সমাজের উত্থানের যে কাজ বনবাসী কল্যাণ আশ্রম শুরু করেছে, তার দায়িত্ব পেয়ে উত্তম নিজেকে ধন্য মনে করেছিল। নিজের ছোটো ভাইয়ের মতো করে আর এক প্রচারক মহাদেব গরাই উত্তমকে কল্যাণ আশ্রমের কাজ হাতে ধরে শিখিয়ে নিয়েছিল। সেই কাজে উত্তম সাতটা বছর নিজেকে সঁপে দিয়েছিল। শহরবাসী আর বনবাসীদের মধ্যে খুব সুন্দর যোগসূত্র স্থাপন করেছিল উত্তম। কল্যাণ ভবনে আয়োজিত তার স্মরণসভায় সবাই বলছিলেন — নাম উত্তম, কাজেও উত্তম।

১৯৮৮ সাল। সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসজীর আহ্বানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একশো যুবক সঙ্ঘের বিস্তারক রূপে বেরিয়ে পড়েন। বাঁকুড়া জেলা থেকেও বেশ কয়েকজন বের হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জলধর মাহাতো, অনাথবন্ধু গোপ ও উত্তম মাহাতো। সেসময় বাঁকুড়া জেলা প্রচারক ছিলেন শচীন্দ্রনাথ সিংহ। তাঁর হাত ধরে তিনজন বিস্তারক খাতড়া থেকে বের হয়। তাদের তিনজনকেই পুরুলিয়াতে দেওয়া হয়েছিল। আমি তখন বলরামপুর মহকুমা প্রচারক। জলধরদাকে পুরুলিয়া নগর বিস্তারক, অনাথবন্ধুদাকে আদ্রা নগর বিস্তারক এবং উত্তমকে বাগমুণ্ডি খণ্ড বিস্তারকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। বলরামপুর মহকুমার মধ্যেই বাগমুণ্ডি খণ্ড। অশোক সাহাদা তখন রঘুনাথপুর মহকুমা প্রচারক। জেলা প্রচারক ছিলেন শঙ্কর মিত্র। সঙ্ঘের কাজে তখন পুরুলিয়াতে ৬ জন প্রচারক।

বাগমুণ্ডি খণ্ডে কল্যাণ আশ্রমের খুব ভালো কাজ। পুরুলিয়ায় অযোধ্যা পাহাড়ে ৮০ টা বনবাসী গ্রাম। পাহাড়ের কোলে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের মাধ্যমে বহু ছাত্রের পড়াশোনা ও সংস্কারের কাজ চলছে। ওই আশ্রম থেকে ছাত্ররা আজ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র, শিক্ষক, অধ্যাপক প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে পৌঁছে তাদের যোগ্যতা প্রদর্শন করছেন। বহু সামাজিক কাজে তাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছেন। সেখানেই দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করেছে উত্তম মাহাতো। সামান্য একটা খাপরার চালের ঘরে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা। ওই নিবাসে উত্তম থাকা মানেই আনন্দের পরিবেশ। নিবাসে গৈরিক পতাকা নামানো আছে দেখেই স্বয়ংসেবকরা বুঝে যেত উত্তমদা অন্য কোনো গ্রামের শাখায় আছেন। গৈরিক পতাকা পতপত করে উড়ছে মানে উত্তমদা নিবাসে আছেন। তখন নিবাসে এলে দেখা যেত স্বয়ংসেবকদের আনন্দমুখর ভিড়।

উত্তমের অনেক গুণের মধ্যে একটি বিশেষ গুণ ছিল একঘণ্টার মধ্যে রান্না করে খাওয়াদাওয়া শেষ করা। নানা রকমের রান্না করতে পারত। লোককে রান্না করে খাওয়াতে খুব ভালোবাসতো। স্বস্তিকার কার্যালয়েও তার হাতের রান্না অনেকেই খেয়েছে। অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে তাপস বারিক একজন। এক জায়গায় জমা হলে গল্পের আসর জমে যেত। খুব মজার মজার গল্প শোনাতে পারত উত্তম।

গত ২০ জুন হঠাৎই খবর আসে মাথাব্যথা আর প্রচণ্ড জ্বরের কারণে হাসপাতালে উত্তমকে বাগুইআটির একটি নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়েছে। সেই অসুস্থতা যে প্রাণঘাতী হবে তা বিন্দুমাত্র আশা করা যায়নি। মস্তিষ্কে সংক্রমণের কারণে কোমায় চলে যায়। ২২ জুন রাতে ইহলোকের সমস্ত মায়া কাটিয়ে অমৃতলোকে যাত্রা করে। ২৩ জুন সকালে তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে সঙ্ঘ ও কল্যাণ আশ্রমের অজস্র কার্যকর্তা ও শুভানুধ্যায়ী কল্যাণ ভবনে সমবেত হন। তার সকলেই তার মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। কল্যাণ আশ্রমের নগরীয় ক্ষেত্রের বহু মা-বোন এসেছিলেন। তাঁদের চোখের জল বাঁধ মানছিল না।

সংগঠনের কার্যকর্তার সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্কের বাইরেও যে একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা সেদিন কান্নাভরা চোখগুলো দেখলে ভালো মতোই অনুভব করা যাচ্ছিল। কল্যাণ ভবন থেকে গ্রামের বাড়িতে যখন মরদেহ পৌঁছায়, তখন শুধু গ্রামের লোকেরাই নয়, আশপাশের গ্রাম, এমনকী দূরদূরান্ত থেকেও অজস্র মানুষ শেষ দর্শন করতে ছুটে আসে। কান্নায় ভেঙে পড়ে সকলেই। মাত্র ৫৩ বছর বয়সে ইহলোক ছেড়ে পরলোক চলে গেল উত্তম। বাড়িতে বৃদ্ধা মা আছেন। চার ভাইয়ের মধ্যে উত্তম সবার বড়ো। পুরো পরিবারই সঙ্ঘময়। বাড়িতে তিন ভাই-বউ, ভাইপো, ভাইঝিরা আছে। তিন ভাই-ই সঙ্ঘের কার্যকর্তা। ছোটো ভাই শিবম গুজরাটের আহমেদাবাদ শহরে থাকে। ওখানে সঙ্ঘের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছে। মেজভাই জেলা কার্যবাহ গৌতমের নেতৃত্বেই হেত্যাপাথর গ্রামের বাড়ি থেকে অজস্র মানুষ শ্মশানযাত্রী হয়।

পরদিন সন্ধ্যায় কল্যাণ ভবনে শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় অনেকেই স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে উঠে আসে এক অনন্য উত্তমের কথা। যে কিনা উত্তম স্বয়ংসেবক, উত্তম কার্যকর্তা, উত্তম প্রচারক, উত্তম সংগঠক, উত্তম গুণের অধিকারী উত্তম ব্যক্তি। সে হারিয়ে যায়নি, সে আছে তাদের কাজের মধ্যে, সে আছে অসংখ্য কার্যকর্তার হৃদয়ের মধ্যে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা, অমৃতলোকে তার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। □

সাজানো মামলায় কণ্ঠরোধের ষড়যন্ত্র

বিপ্লব বিকাশ

বর্তমানে আমরা পশ্চিমবঙ্গে এক ভয়াবহ রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে চলছি। যেখানে ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির মতো জঘন্য অপরাধকে আইন ও ন্যায়ব্যবস্থার পরিসরে না রেখে এখন একটি পরিকল্পিত রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত করা হয়েছে। আজকে শাসকদলের বিরুদ্ধে যে কণ্ঠ সোচ্চার হয়, সেই কণ্ঠ স্তব্ধ করতে ব্যবহৃত হয় শ্লীলতাহানির অভিযোগ, মাদক সংক্রান্ত মামলা বা অন্য সাজানো অভিযোগ। এই প্রবণতা শুধু বিরোধীদের উপরেই নয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিসরের সম্মাননীয় ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের দিকেও ধেয়ে আসছে।

পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজের বিরুদ্ধে শ্লীলতহানির অভিযোগ আনা হয়েছে। এক মহিলা ২০১৩ সালের এক পুরনো অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা করেছেন। সবারই মনে আছে, ২০২৪ সালের মে মাসে কার্তিক মহারাজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছিলেন। এক বছর হয়নি, সন্ন্যাসী মহারাজকে 'ঠাণ্ডা করে দেওয়া'র মামলা ঠুকে দেওয়া হলো। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, অভিযোগকারিণী এতদিন চুপ ছিলেন কেন? তিনি হঠাৎ করেই কীভাবে এমন গুরুতর অভিযোগ আনলেন? কেন এই মামলার সময়টি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের ঠিক এক বছর পর এবং রাজনৈতিক আবহ উত্তপ্ত হওয়ার সময়েই উত্থাপিত হলো? এসব ঘটনা দেখে-শুনে রাজনীতির সাধারণ পর্যবেক্ষকও বুঝবেন এটি একটি নিছক সাজানো ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। এর মূল উদ্দেশ্য একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে কলঙ্কিত করা এবং তাকে চুপ করে থাকতে বাধ্য করা, ও নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া। কেননা তিনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার।

রাজনীতিতে সময়ের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। গত ২৫ জুন সাউথ কলকাতার ল কলেজে ২৪ বছরের এক ছাত্রীকে কলেজ ক্যাম্পাসে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা ২ জনকে সঙ্গে নিয়ে গণধর্ষণ করে। এই ঘটনার পর কলেজ প্রশাসন ও মহিলা মুখ্যমন্ত্রী একদম চুপ। কিন্তু কেন? মিডিয়া ও সমাজে যখন এ বিষয়ে তুমুল ঝড় উঠেছে, ঠিক সেই সময়ে কার্তিক মহারাজের উপর সাজানো মামলা চাপানো হলো। উদ্দেশ্য একদম পরিস্কার, সমালোচনার দিশা ঘুরিয়ে দেওয়া এবং ২০২৬ সালের নির্বাচনের আগে সক্রিয়, প্রভাবশালী ও সাহসী সন্ন্যাসীর মুখ বন্ধ করে দেওয়া।

আমরা বার বার দেখেছি, প্রকৃত অপরাধী, যারা সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, কর্মীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী, তারা প্রায়শই প্রশাসনের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকে। আইন কলেজের ছাত্রীকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা গণধর্ষণ করে, ভিডিয়ো করে, ব্ল্যাকমেইল করে। অথচ কলেজ কর্তৃপক্ষ, শিক্ষামন্ত্রী, এমনকী স্বঘোষিত নারীবাদী মুখ্যমন্ত্রী চুপ করে থাকেন।

> **কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে বিরোধী, কে শাসকদলের, তা নয়। বরং কে অপরাধী, কে মিথ্যা বলছে আর কে সত্য বলছে, তা বোঝার চেষ্টা করা উচিত।**

সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর বছরের পর বছর ধরে শারীরিক নির্যাতন, অত্যাচার, জমি দখলের অভিযোগ উঠলেও অভিযুক্ত জেহাদি বাহিনীর বিরুদ্ধে কঠোর কোনো পদক্ষেপ নিতে আজও দেখা যায়নি। শাজাহানকে বাঁচানোর জন্য এই রাজ্য সরকার সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে চলে গেছিল। কীসের অভিযোগ থেকে বাঁচাতে? না, মহিলাদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগ থেকে বাঁচাতে।

এই বৈপরীত্য আর নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে নারী নিরাপত্তা, হিন্দুদের মর্যাদা, এমনকী আইন ও বিচারব্যবস্থা আজ এক কঠিন রাজনৈতিক সংকটের মুখে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃত অপরাধী যদি শাসক দলের ঘনিষ্ঠ হয়, তাহলে সে রক্ষা পায়, আর যদি কেউ শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, তবে তাকে মিথ্যা মামলা ও চরিত্রহননের মাধ্যমে তাকে 'ঠাণ্ডা' করে দেওয়া হয়। এর ফলে ধর্ষণের শিকার নারীরা বিচার পান না। বদলে বাধা পান। আর মিথ্যা অভিযোগে নিরপরাধ ব্যক্তিরা সম্মান হারান।

এই অবস্থা চলতে পারে না। চলতে দেওয়া যায় না। জনগণের উচিত এখন রাজনীতির বাইরে দাঁড়িয়ে। এই ঘটনাগুলির বিশ্লেষণ করা। কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে বিরোধী, কে শাসকদলের, তা নয়। বরং কে অপরাধী, কে মিথ্যা বলছে আর কে সত্য বলছে, তা বোঝার চেষ্টা করা উচিত। আমাদের সমাজ, আমাদের নারীরা, আমাদের সংস্কৃতি আজ ভয়ংকর ঘূর্ণিতে নিমজ্জিত। আর একটু দেরি হলেই সমূলে বিনাশ। এখনই সময় প্রশ্ন তোলার, প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ করার। সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে হবে, এখনই। □

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(২৬)

সুপাত্রে কন্যা দান

আর্বীতে বসবাসকারী গঙ্গাধররাও ছিলেন ডাক্তারজীর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একবার ডাক্তারজী আর্বীতে এলে বিকেলে বন্ধুরা গঙ্গাধররাও দেশপাণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। কথাবার্তা বলতে বলতে ডাক্তারজীর মনে হলো যে দেশপাণ্ডেজী মানসিক দিক থেকে বোধহয় কোনো সমস্যায় আছেন। মুখে একটা মলিন্যের ছাপ। সরাসরি তিনি তার অনুভূতির কথা দেশপাণ্ডেজীর কাছে জানতে চাইলে তিনি জানালেন যে, 'ভাগ্নীর চিঠি এসেছে, অত্যন্ত দুঃখ করে লিখেছে নাগপুরে তার কাকা তাকে জোর করে এক বুড়োর গলায় ঝুলিয়ে দিতে চাইছেন'। একথা শুনে ডাক্তারজীর মনও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। তিনি গঙ্গাধর রাওকে জিজ্ঞেস করলেন— 'আপনার কী ইচ্ছা?'

গঙ্গাধররাও কিছু বলতে পারছিলেন না এক শূন্য দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন শুধু। তার ইচ্ছা যেন সেই দৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছিল। এবার ডাক্তারজী বললেন— 'আপনি যদি বিয়ের খরচ বহন করতে রাজি থাকেন তবে আমি দেখতে পারি কী করা যায়'। গঙ্গাধর যেন হাতে চাঁদ পেলেন। মনে হলো স্বয়ং ঈশ্বর ডাক্তারজীকে পাঠিয়েছেন, তিনি সহর্ষে ডাক্তারজীর এই প্রস্তাবে রাজি হলেন।

গঙ্গাধররাওকে নিয়ে ডাক্তারজী বিয়ের বেশ কিছু আগে নাগপুরে পৌঁছে গেলেন। একজন বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে দিয়ে ডাক্তারজী মেয়েটির কাছে খবর পাঠালেন— 'গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানের সময় তোমার মামা গঙ্গাধরজী গাড়ি নিয়ে উপস্থিত থাকবেন, তুমি যাওয়ার জন্য তৈরি থাকবে'। এবার যা ঘটল তা একেবারে সিনেমার চিত্রনাট্যের মতো। বাজনা সানাই বাজিয়ে গায়ে হলুদের শোভাযাত্রা করে মেয়েটিকে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখনই পূর্বপরিকল্পনা মতো তিনি গঙ্গাধররাওয়ের গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ান। আর সংকেত পাওয়ামাত্র মেয়েটি সেই গাড়িতে চড়ে বসল। সোজা আর্বী। মামার বাড়িতে। বোঝাই যাচ্ছে তখন বিয়েরবাড়ির অবস্থা। হইচই ছুটোছুটি, অগ্নিশর্মা কাকা এই নিয়ে মামলাও ঠুকে দিয়েছিলেন। মামলা চলছিল কিন্তু বুড়োর হাত থেকে মেয়েটি রক্ষা পেল, আর উপযুক্ত পাত্রে।

(২৭)

স্বাভিমান

ডাক্তারি পড়াকালীন কেশবরাও বছরে দুবার ছুটিতে নাগপুরে আসতেন। রামপায়লীতে কাকার বাড়ি। নাগপুরে ডাঃ মুঞ্জে এবং শ্রী তাত্যা ফড়নবীশ, ওয়ার্ধাতে বন্ধু গঙ্গাধররাওয়ের এর বাড়ি-সহ আরও কিছু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। তাদের বাড়ি থেকে একটা পারিবারিক সম্পর্ক তৈরি ও রক্ষা করা তার ছিল ছুটির বড়ো কাজ। একবার এরকম ছুটিতে তিনি বন্ধু যাদবরাও আনের বাড়িতে ইয়তমল গিয়েছিলেন। একদিন বিকেলে কেশবরাও দুই বন্ধু যাদবরাও ও গোবিন্দরাও আবদে-সহ সিভিল লাইন্সের রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। হঠাৎ দেখা গেল সামনে থেকে ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একজন সরকারি ডাক্তার ও অফিসার আসছেন। এই ইংরেজ তথাকথিত প্রভুদের প্রতি মানুষের মনের যে ভীরুতা, মর্যাদাহীনতাবোধ জন্ম নিয়েছিল তার থেকে কিছু নিয়ম তৈরি হয়ে গিয়েছিল। যদি রাস্তায় এমন কোনো ইংরেজ আসতে দেখা যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষকে রাস্তার পাশে সরে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে এবং সামনে দিয়ে চলে যাবার মুহূর্তে অত্যন্ত বিনম্রভাব দেখিয়ে স্যালুট করতে হতো। কেশব এখানে নতুন, তাই তার বন্ধুরা আগে ভাগেই তাকে এই নিয়মের কথা বুঝিয়ে দিল এবং সাহেব চলে এলে স্যালুট করতে বললো। কিন্তু কেশবরাওয়ের ধাতে তো হীনম্মন্যতার প্রশ্রয় কোনোদিন ছিল না। তিনি পরিষ্কার বললেন— 'এটা সার্বজনীন রাস্তা, আমি যেমন চলছি তেমনই চলতে থাকবো'। একসময় কথা বলতে বলতে সেই ত্রিমূর্তি তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। কিন্তু কয়েক পা এগোতেই যেন তাদের সংবিৎ ফিরে এল— 'একি বেয়াদবি! রাস্তার পাশে সরে দাঁড়ানো দূরে থাক, স্যালুট পর্যন্ত দিল না, ইচ্ছে করে লেজে পা, ফণাতো তুলতেই হবে। দ্রুত কয়েক পা পেছিয়ে কেশবদের সামনে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সর্বোচ্চ কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন--- 'স্যালুট দেওয়ার শিষ্টাচার জানো না?' শান্ত অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে কেশব উত্তর দিল— 'এমন ভাবে জিজ্ঞাসা করাই তো অসুস্থতা'। আমি রাজধানীর লোক। এখানকার এ ধরনের শিষ্টাচারের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? রাজধানীতে এরকম বিষয় শিষ্টাচার বলে গণ্য হয় না। সেখানে এরকম কোনো নিয়ম নেই; তাছাড়া বিনা পরিচয়ে একজন হঠাৎ অপরিচিত ব্যক্তিকে নমস্কার বা অভিভাবাদন জানাবে, এ কোথাকার শিষ্টাচার? এমন কথা বলার সময় কেশবরাওয়ের হাত কোর্টের পকেটে ছিল। পাশে দাঁড়ানো সরকারি ডাক্তার পেড্রো কেশব রাওকে একটু বোঝাবার জন্য বললেন— ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কী! পকেট থেকে হাতটা বের করে নিন আর একবার টুক করে একটা স্যালুট দিয়ে চলে যান। কেশব তার দিকে একবার তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন--- 'এই পরামর্শের জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ'। বলেই মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন তার নির্ধারিত পথে। বলাই বাহুল্য, এ নিয়ে সরকারি মহলে বেশ একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। কেশবরাও নাগপুরে এসে এই ঘটনার কথা বিস্তারিত ডাঃ মুঞ্জেকে জানালে তিনি কেশবের পিঠ চাপড়ে বললেন--- সাবাশ! কেশব, সাবাশ!

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস